এ-ডি-সি

নিমাই ভট্টাচার্য

কুন্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দ্যেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge,

No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

বিরাট আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ব্যাক ব্রাশ করতে করতে ক্যাপ্টেন রায় গুন্‌গুন্‌ করে সুর আওড়াচ্ছিলেন, 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে–।'

কোন্‌ মণিহার? আমি অফিসার হয়ে এই এ-ডি-সি-র চাকরি? নাকি মণিকা?

বোধহয় মনে মনেই নিজেকে প্রশ্ন করেন ক্যাপ্টেন রায়। মুখে কিছু বলেন না, শুধু ঠোঁটের কোণায় মিষ্টি হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সামনের আয়নায় দেখে চোখ দুটো কেমন যে রোমান্টিক হয়ে নীরব ভাষায় কত কথা বলে।

ব্যাক ব্রাশ করতে করতেই একবার হাতের ঘড়ি দেখে নেন। না, ঠিক আছে। এখনও পঁচিশ মিনিট হাতে আছে।

মুখখানা একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখে নেন। ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ দেখাচ্ছে। সকাল বেলায় হট বাথ নেবার পর শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও বেশ সতেজ হয়ে ওঠে। তারপর ইউনিফর্ম পরলে বেশ লাগে।

ব্রাশটা নামিয়ে রাখলেন। এবার একটু পিছিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজেকে আবার ভালোভাবে দেখে নেন। 'ও-কে!'

আবার গুন্‌গুন্‌ করে কি যেন একটা সুর আওড়াতে আওড়াতে ক্যাপ্টেন রায় ওপাশে একটু এগিয়ে গিয়ে একটা সেন্টার টেবিল থেকে আর্ম ব্যাচটা তুলে নিলেন। স্যাফরন কলারের ব্যাচের মাঝে ভুলে যাওয়া অতীত ভারতের অশোকস্তম্ভ। ওটা এখন ভারতের প্রতীক। আর্ম ব্যাচের ওই অশোক পিলারের প্রতিকৃতি দেখে মুচকি হাসেন ক্যাপ্টেন রায়। হাসবেন না? মনে মনে ভাবেন যদি কোনো মাস্টারমশাই ধরনের লোক জিজ্ঞাসা করেন, 'ওহে ছোকরা, বৈষ্ণবদের তিলক কাটার মতো সর্বাঙ্গে তো অশোকস্তম্ভের ছড়াছড়ি! বলতে পার সম্রাট অশোক কোথায় জন্মেছিলেন? কবে জন্মেছিলেন? এই অশোকস্তম্ভ কোথায় পাওয়া গিয়েছিল?'

এসব কিছু জানে না সে। হয়তো স্বয়ং গভর্নরই...। চাকরি করতে কি জ্ঞান বুদ্ধির দরকার হয়? তাহলে তো প্রায় কারুরই চাকরি বাকরি করা হতো না। ইউনিভার্সিটির একটা চোথা সার্টিফিকেট হলেই সরকারি চাকরি পাওয়া যায়। বিদ্বান, বুদ্ধিমান বা কর্তব্যপরায়ণ হলে চাকরিতে বিভ্রাট হয়।

এই সাত সকালে যত সব আজেবাজে চিন্তা! ক্যাপ্টেন রায় আর্ম ব্যাচটি তুলে হাতে পরেন। বেশ লাগে দেখতে।

চট করে আবার হাতের ঘড়ি দেখে নেন। না, না, আর দেরি নয়। আটটা কুড়ি হয়ে গেছে। মাত্র দশ মিনিট বাকি। ওপাশের টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে পার্সটা পকেটে পুরে নিলেন, পেন, বলপেনটাও তুলে নিলেন।

দরজায় দুবার নক্‌ করার আওয়াজ হল।

'কাম ইন।'

অশোকস্তম্ভ মার্কা সিগারেটের একটা টিন ও একটা দেশলাই হাতে করে আমজাদ আলি ঘরে ঢুকল।

'নমস্তে।'

নমস্তে বলেই হাত বাড়িয়ে সিগারেটের টিন আর দেশলাইটা নিলেন ক্যাপ্টেন রায়।

সব সময় অবশ্য গৌরবে বহুবচন হয় না। গভর্নরের অবর্তমানে বা প্রোটোকলের নিয়মানুসারে অনেক সময় এ-ডি-সি-কেই গভর্নরের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। ভাগ্যক্রমে অনেক সময় সে-সব ছবিও খবরের কাগজের পাতায় পরদিন সকালে দেখতে পাওয়া যায়।

আমজাদ আলি বেড-টি তৈরি করতে করতেই ক্যাপ্টেন রায় দেখে নেন খবরের কাগজের পাতায় নিজের বা অন্য সহকর্মীর ছবি। বেশ লাগে। চীফ্ অফ্ দি আর্মি স্টাফের ছবি নানা কারণে খবরের কাগজে ছাপা হলেও লেফ্‌টেনান্ট জেনারেল বা মেজর জেনারেলের ছবি খবরের কাগজে ছাপা হয় না বললেই চলে। অথচ ক্যাপ্টেন রায়ের মতো এ-ডি-সি-দের ছবি হরদম কাগজে ছাপা হচ্ছে।

একটা স্কুল গ্লোবের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিতে যে সময় লাগে, তার চাইতেও কম সময়ে বিশ্ব সংবাদ পরিক্রমা সমাপ্ত করেন এ-ডি-সি সাহেব। তারপর দেখে নেন গভর্নরের কোনো ছবি আছে কিনা। সত্যিকার কোনো ভি-আই-পি-র আগমন নির্গমন হলেই গভর্নর সাহেবকে যেতে হয় দমদম এয়ারপোর্টে। এক গোছা ফুল তুলে দিতে হয় সেই ভি-আই-পি-র হাতে। অথবা দন্ত বিকশিত করে একটা হ্যান্ডসেক। ব্যাস! সূর্যের আলোকে ম্লান করে দিয়ে জ্বলে উঠবে প্রেস ফটোগ্রাফারদের ফ্ল্যাশ বাল্বের আলো। হাই অফিসিয়াল আর পুলিশের হুড়োহুড়িতে তখন কেউ খেয়াল করেন না, কিন্তু পরের দিন সকালের কাগজগুলিতে ঠিক দেখা যাবে কি একটা অজ্ঞাত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ভি-আই-পি আর গভর্নরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সোনালি-রূপালী বিচিত্র পোশাক পরা এ-ডি-সি!

সভা-সমিতি, লাঞ্চ-ডিনারে গভর্নর বক্তৃতা দিলেও অনেক সময় ছবি ছাপা হয়। সেখানেও লাটসাহেবের পাশে পাওয়া যাবে এ-ডি-সি-কে।

আমজাদ বেড-টি দিয়ে চলে যায়। আবার আসে ঠিক সাড়ে সাতটায়। প্রায় আড়াই ফুট লম্বা রূপোর ট্রে করে নিয়ে আসে ব্রেকফাস্ট। আর আসে এই আটটা পঁচিশে। সিগারেট-দেশলাই দিতে।

অশোকস্তম্ভ মার্কা সিগারেটের টিনটা পকেটে পুরতে পুরতে আবার হেসে ফেলেন ক্যাপ্টেন রায়। হাসবেন না? অশোকস্তম্ভ মার্কা এই সিগারেট খাদি প্রতিষ্ঠানে তৈরি হয় না। পাক্কা বিলেতি কোম্পানির সিগারেট ডবল মাশুল দিয়ে এই স্বদেশীপনার ন্যাকামি প্রচার করা হয় দেশ-বিদেশের অতিথিদের কাছে। দুষ্টু সন্ন্যাসীরা যেমন কাঁচা বিধবা সেবাইত রেখে ভোগ করেন, অনেকটা সেই রকম আর কি! সাধাসিধে মানুষদের ধোঁকা দেবার জন্য চাই মোটা খদ্দর আর রাতের আবছা আলোয় চাই পাক্কা স্কচ! ইতালিয়ান ভারমুখ বা মার্টিনী হলেও চলবে না।

আমজাদের সঙ্গে সারাদিনে আর দেখা হবে না। রোজ সকালে মেসিনের মতো তিনবার আমজাদ আসে এ-ডি-সি সাহেবের ঘরে। সাড়ে ছটায় ছোট্ট এক পট চা আর একটা সিঙ্গাপুরী কলা নিয়ে। ওই বেড-টি দেবার সময়ই কলকাতার মর্নিং পেপারগুলো নিয়ে আসে আমজাদ। আমজাদই চা তৈরি করে। আর সেই ফাঁকে এ-ডি-সি সাহেব চোখ বুলিয়ে নেন খবরের কাগজগুলোতে।

আর দেরি করেন না ক্যাপ্টেন রায়। প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে পড়েন ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে করিডোরে পা দিতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ান লর্ড ওয়েলেসলীর ওই বিরাট

পেন্টিংটার সামনে। ওই মুহূর্তের মধ্যেই ক্যাপ্টেন শ্রদ্ধা জানান ওই মহাপুরুষকে যাঁকে ইংরেজরা ঠাট্টা করে বলত Sultanized Englishman. ইংরেজ হয়েও যিনি সুলতানের মতো প্রমত্ত থাকতে ভালোবাসতেন—যিনি লালকেল্লা-কুতব-মিনার-তাজমহল তৈরি না করলেও ডালহৌসী পাড়ায় লাটসাহেবের ওই প্রাসাদ তৈরি করেছেন, তাঁকে বড় ভালো লাগে ক্যাপ্টেন রায়ের। ইতিহাসের পাতায় লর্ড ওয়েলেসলীর নাম লেখা থাকলেও ভারতের মানুষ তাঁকে ভুলে গেছে। আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকরা হয়তো নানা অপকীর্তির জন্য লর্ড ওয়েলেসলীর বিদেহী আত্মাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে, কিন্তু গভর্নর থেকে শুরু করে রাজভবনের জমাদার পর্যন্ত তাঁকে লুকিয়ে শ্রদ্ধা করবেই। ক্যাপ্টেন রায় তো তাই ডিউটিতে যাবার আগে ওয়েলেসলীর ওই পেন্টিংটার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেন না।

এগজ্যাক্টলি অন্ দি ডট্! কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন রায় আধ ডজন বেয়ারার সেলাম নিতে নিতে অফিসে হাজির। লাটসাহেবের ছাপান প্রোগ্রাম সামনেই রয়েছে।

ছাপান প্রোগ্রাম?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছাপান। সোস্যালিস্ট ভারতবর্ষের নাবালক সংবিধানের সাবালক অভিভাবককে কি টাইপ করা কাগজে ডেইলি এন্‌গেজমেন্ট দেখান যায়?

সাধারণত সাড়ে আটটা নাগাদই লাটসাহেবও নিজের অফিসে আসেন। সারা দিনের কাজকর্ম নিয়ে এ-ডি-সি ও সেক্রেটারির সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলেন। তারপর তিনি ভিজিটার্সদের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করেন।

...লাটসাহেবের দপ্তরের দুটি ভাগ। সেক্রেটারি টু দি গভর্নরই সর্বেসর্বা। তবে সাধারণত তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে গভর্নরের যোগসূত্র রক্ষা করেন বা তদারক করেন। প্রতিদিন বেশ কিছু সরকারি ফাইলে ও নথিপত্রে গভর্নরকে অটোগ্রাফ দিতে হয়। ঠিক টপ সিক্রেট কাগজপত্র কিছু নয়। অধিকাংশই মামুলি ধরনের আর আসে ক্যাবিনেটের কাগজপত্তর। মন্ত্রীদের ফরমায়েস মতো চীফ সেক্রেটারি বা হোম সেক্রেটারি মারফত যে সব ফাইলের বাণ্ডিল আসে গভর্নরের সেক্রেটারির কাছে, চটপট গভর্নরকে দিয়ে সই করিয়ে সে-সব ফাইল ফেরত পাঠানই সেক্রেটারির প্রধানতম কাজ। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও টুকটাক চিঠিপত্র আসে। সে-সবের সদ্‌গতি করাও ওই সেক্রেটারি সাহেবেরই কাজ।

রাজভবনের দেখাশুনা, অতিথি আপ্যায়ন, সরকারি অতিথি-শালা পরিচালনা, গভর্নরের ভ্রমণসূচী ঠিক করা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করা ইত্যাদি সব কাজই আগে দেখাশুনা করতে মিলিটারি সেক্রেটারি। ওটা ইংরেজ আমলের নিয়ম ছিল। বীরপুরুষ ইংরেজ যেকালে মনে করত সব ইন্ডিয়ানদের পকেটেই একটা রিভলভার থাকে, সেকালে মিলিটারি সেক্রেটারি ছাড়া ও সব দায়িত্বকে বহন করতে পারত? জমানা বদল গয়া। এখন একজন মামুলী ধরনের ডেপুটি সেক্রেটারি, মিলিটারি সেক্রেটারির কাজ করেন। সাধারণত যেসব অফিসারকে দিয়ে সেক্রেটারিয়েটের দায়িত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই অথচ ফালতু মাতব্বরী করতে শিরোমণি, তাদেরই পাঠান হয় রাজভবনে।

রাজভবনে পোস্টিং পাওয়া অবশ্য শাপে বর। যাগ্‌গে সেসব কথা।

এ-ডি-সি-দের কাজ হচ্ছে গভর্নরের খিদমদগারি করা। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যাধ্যক্ষের হুকুম যাঁরা তামিল করেন, তাঁদেরই বলা হতো এইড-ডি-ক্যাম্প্। জাপানের সম্রাট, রাশিয়া বা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এ-ডি-সি নেই কিন্তু আমাদের গভর্নরদের তিন তিনজন করে এ-ডি-সি থাকে। আশে পাশে কিছু মোসাহেব বা খিদমদ্গার ভ্রমরের মতো গুঞ্জন না করলে জমিদার ইংরেজ

ঠিক শান্তি পায় না। নিজের দেশে বৌ বাসন মাজবে, কাপড় কাচবে, নিজে গাড়ি চালাবে কিন্তু জমিদারিতে এলেই সব ঠুটো জগন্নাথ। তখন কথায় কথায় সেলাম চাই, সেক্রেটারি চাই, সোফার চাই, আয়া চাই, কুক চাই, চাই এ-ডি-সি আর কত কি!

বেশ লাগে দেখতে। হঠাৎ দেখে বুঝবার উপায় নেই যে এরা রাষ্ট্রপতি ভবন বা রাজভবনের বেয়ারা, চাপরাশী, অর্ডালী বা অন্য কিছু। মনে হবে চিৎপুরের যাত্রা পার্টির মীরমদন, মীরকাশিম বা সিরাজের সৈন্যবাহিনীর অন্য কেউ।

ডালহৌসী পাড়ায় বাঙালির ছেলেরা বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে মুখের গ্রাসের জন্য দিবারাত্র সংগ্রাম করছে। জীবন-সংগ্রামের এই অকূল সমুদ্রের মাঝখানে রাজভবন একটি ছোট্ট দ্বীপ। অমরাবতী, অলকানন্দা। ক্লাইভ, কার্জন, ডালহৌসীর আত্মা যেন ওখানে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর মীরমদন, মীরকাশিমের দল তাদের খিদমদ্গারী করছে।

ক্যাপ্টেন রায়ের বেশ মজা লাগে। ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের ওই ব্যারাকের জীবন থেকে রাজভবন। এ যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ। বেগম নেই, বাদশা নেই, সন্ধ্যাবেলায় নর্তকীর ঘুঙুরের আওয়াজ নেই, নেই সেতারে দরবারি কানাড়া ও মেঘমল্লারের ঝঙ্কার কিন্তু তবু এ যেন বিংশ শতাব্দীর অচিন দেশ!...

পৌনে নটা নাগাদ ছোট্ট একটা তুড়ির আওয়াজ! মীরমদন, মীরকাশিমের দল সম্ভ্রমে সন্ত্রস্ত হয়ে আর একটু সোজা হয়ে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন রায় সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ইউনিফর্মটা একটু ঠিক করে নিয়েই বেরিয়ে করিডোরে গেলেন। মুহূর্তের মধ্যেই গভর্নর সাহেব বেরিয়ে এলেন অন্দরমহল থেকে।

স্মার্ট আর্মি অফিসারের মতো ক্যাপ্টেন রায়ের দুটো বুটে একটা ছোট্ট ঠোকাঠুকি আর সঙ্গে সঙ্গে একটা স্যালুট।

গভর্নর সাহেব ডান হাতটা তুলে প্রত্যভিবাদন জানালেন।

তারপর একটু মাথা নীচু করে ক্যাপ্টেন রায় বললেন, 'গুডমর্নিং! ইওর একসেলেন্সী!'

'গুডমর্নিং!'

সিরাজের সৈন্যবাহিনী করজোড়ে মাথা নীচু করে প্রভুভক্তি দেখাল।

গভর্নর নিজের অফিস কক্ষে গেলেন। ছায়ার মতো তাঁকে অনুসরণ করলেন এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন রায়।

গভর্নর সাহেব চেয়ারে বসে বলেন, 'আজ কেয়া হ্যায়?'

'স্যার, সকালে তিনজন ভিজিটার্স আছেন। আফটারনুনে মরক্কোর অ্যাম্বাসেডর আসবেন আর ইভনিং-এ মিস রমলা যোশীর একজিবিশন ওপেনিং আছে।'

'কোনো গেস্ট আসছেন নাকি আজ?'

'লেট নাইটে বম্বে থেকে ইউনিয়ন ডেপুটি মিনিস্টার ফর সাপ্লাই আসছেন।'

গভর্নর সাহেবের চোখমুখ দেখে মনে হল ডেপুটি মিনিস্টার সাহেবের আগমনের খবর শুনে মোটেও খুশি হলেন না।

'হাউ লং উইল হি স্টে হিয়ার?'

'স্যার, উনি চারদিন থাকবেন।'

'চা–র–দি–ন?'

'ইয়েস স্যার।'

এ-ডি-সি তো নিজের লোক। গভর্নর সাহেব আর মনের কথা চেপে রাখতে পারেন না।

বলেন, 'বুঝলে ক্যাপ্টেন, আগে এইসব লোক বড়বাজারের গলিতে কোনো কাটা কাপড়ের দোকানদারের বাড়িতে উঠত!' একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলে পারলেন না হিজ এক্সেলেন্সী। 'আর আজ! এরাও গভর্নমেন্ট হাউসে উঠছে!'

কথাটা বলেই শান্তি পেলেন না। সমর্থনের জন্য এ-ডি-সি-র দিকে তাকালেন।

ক্যাপ্টেন রায় কি করবেন? মাথাটা একটু নেড়ে চাপা গলায় বললেন, 'ইয়েস স্যার!'

'বুঝলে ক্যাপ্টেন...'

গভর্নর সাহেব আরো কি বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। দরজার কোণা থেকে একজন বেয়ারা এ-ডি-সি সাহেবকে কি যেন একটা ইসারা করল।

'এক্সকিউজ মি স্যার! আমি এক মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

ক্যাপ্টেন রায় চটপট বেরিয়ে নিজের অফিসে গিয়েই নামিয়ে রাখা টেলিফোন রিসিভারটা তুলে নিলেন।...'ক্যাপ্টেন রয় হিয়ার...'

ওপাশ থেকে কিছু শোনার পর ক্যাপ্টেন রায় বললেন, 'উনি এসে গেছেন? দ্যাটস্ অল রাইট। উপরে পাঠিয়ে দিন।'

এ-ডি-সি আবার গভর্নরের অফিসে গেলেন।

'স্যার, মিঃ জগতিয়ানী আসছেন। এখানেই বসবেন নাকি ড্রয়িংরুমে যাবেন?'

'আরো তো অনেকে আসছেন। অনেকক্ষণ তো বসতে হবে, সো লেট মি গো টু ড্রইংরুম।'

গভর্নর ড্রইংরুমে চলে গেলেন। ক্যাপ্টেন রায় গেলেন নিজের অফিসে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই বেয়ারা মিঃ জগতিয়ানীকে নিয়ে এল এ-ডি-সি-র ঘরে।

ক্যাপ্টেন রায় উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা এগিয়ে দিলেন। করমর্দন করতে করতে বললেন, ''হাউ ডু ইউ ডু স্যার?'

'আই অ্যাম ফাইন। হাউ ডু ইউ ডু?'

ক্যাপ্টেন সিগারেট কেসটা এগিয়ে দিলেন।

'না, না, আমি সিগারেট খাই না।'

'বাঃ, আপনি তো বেশ বাংলা বলেন।'

'ভবানীপুরে জন্মেছি, সাউথ সুবার্বন স্কুলে পড়েছি। বাংলা বলব না?

ক্যাপ্টেন রায় খুশি হন। মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

মিঃ জগতিয়ানী মজা করার জন্য বললেন, ''আমি যা বাংলা বই পড়েছি, তা বোধহয় আপনাদের মতো অনেক অফিসারই পড়েননি।'

'খুব ভালো কথা।'

ক্যাপ্টেন রায় হাতের ঘড়িটা দেখেই 'বাজার' বাজালেন। বেয়ারা ঘরে আসতেই মিঃ জগতিয়ানীর নাম ছাপান স্লিপটা তাকে দিলেন। একটু পরেই বেয়ারা ফিরে এল। ক্যাপ্টেন রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলুন।'

ড্রইংরুমের দরজায় দুবার নক করেই এ-ডি-সি ভিতরে ঢুকলেন।

'...স্যার, মিঃ জগতিয়ানী ইজ হিয়ার।'

মিঃ জগতিয়ানী ঘরে ঢুকতেই ক্যাপ্টেন রায় বেরিয়ে এলেন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা বেয়ারা চা আর কিছু নাটস্ নিয়ে ওই ঘরে ঢুকল।

নিজের অফিসে ফিরে এসে ক্যাপ্টেন রায় সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছাড়লেন।

ওই চেয়ারে বসেই একটু কাত হলেন। একটু যেন তলিয়ে গেলেন। এ-ডি-সি-র চাকরিতে মজা অনেক। তবে সব চাইতে বেশি মজা বিচিত্র মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে।

আবার সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন ক্যাপ্টেন রায়।

স্কুলে পড়ার সময় মনে হতো কত ছেলের সঙ্গে ভাব। তারপর কলেজে পড়বার সময় মনে হয়েছিল, দুনিয়ার সবার সঙ্গেই আলাপ হয়ে গেছে। মানুষ সম্পর্কে এত অভিজ্ঞতা বোধ করি আর কারুর হয়নি, হতে পারে না। আরো পরে আর্মিতে ঢোকার পর মনে হল, দুনিয়ার বিচিত্র মানুষদের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় হল।...

দেরাদুন ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমির মেসের একই ঘরে থাকত ওরা দুজনে। ক্যাপ্টেন রায় তখন ক্যাডেট রায়। ক্যাডেট কমল রায়। জেনকিন্সও এই ব্যাচের ছিল। পার্ক সার্কাসের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবারে জন্ম হলেও মনে মনে পুরোপুরি বাঙালি ছিল। কবিতা লিখতে জানত না বটে তবে ভাব প্রবণতায় বাঙালির ছেলেদেরও হার মানাত। প্রবাসী বাঙালি বলে কমল বরং ওর চাইতে অনেক কম ভাবপ্রবণ ছিল। তবু বড় ভাব ছিল দুজনে।

ছুটির দিনে দুজনে সাইকেলে চেপে প্রথমে যেত এফ-আর-আই-এর ওই ছোট্ট মার্কেটের কোণার নোংরা রেস্তোরাঁয়।

জেনকিন্স বলত, 'বাঙালি হয়ে নোংরা রেস্টুরেন্টে না খেলে যেন মন তৃপ্ত হয় না।'

দুজনে দুকাপ চা খেয়ে চলে যেত শহরে, দেরাদুনে। রাজপুর রোডের ধারে কোনো একটা সিনেমা হলে ঢুকে পড়ত। কোনো কোনো দিন আবার সিনেমা হলে না ঢুকে ওই রাজপুর রোড ধরেই আরো এগিয়ে যেত সাইকেলে চড়ে। শহরের ধারে পাহাড়ের কোলে বসে গল্প করত ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কেন ছুটিতে? কত কি করেছে দুজনে।

একবার ছুটি থেকে ফিরে ক্যাডেট কমল রায় মেসে এসে আর দেখতে পেল না জেনকিন্সকে। একদিন, দুদিন, তিনদিন পর হয়ে গেল। জেনকিন্সের পাত্তা নেই। কমলের মনটা বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কয়েকদিন পরে অফিসে খবর নিয়ে জানল, মার্ডার করার দায়ে জেনকিন্স জেল হাজতে।

জেনকিন্স মার্ডার করেছে? অনেক চিন্তা ভাবনা করার পরও বিশ্বাস করতে পারল না। মাস কয়েক পরে হঠাৎ জেনকিন্সের ছোট্ট একটা চিটি পেল কমল।

'...প্রেসিডেন্সি জেলের একটা 'সেল' থেকে এই চিঠি লিখছি। দুনিয়ার সব চাইতে জঘন্যতম কাজ—মানুষ হত্যা আমি করেছি। কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পীর সৃষ্টিতে যে মাকে মহীয়সীরূপে দেখিয়েছে, যাঁর গর্ভে জন্মে আমি ধন্য হয়েছি সেই তিনি পয়সার জন্য এত নীচে নামতে পারবেন, ভাবতে পারিনি। হাজার হোক নিজের মা। তাইতো রিভলভারটা তাঁর দিকে তুলতে পারলাম না, যে পিশাচ মাকে কলুষিত করেছিল, সেই তাকেই একটা গুলিতে শেষ করে দিলাম।...'

'আর কেউ না হোক, অন্তত তুমি আমাকে বিশ্বাস করো।...'

চমকে উঠেছিল ক্যাডেট কমল রায়। এই দুনিয়ায় এও হয়?

এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন রায় সেদিনের কথা ভেবে আপন মনে হাসে। হাসবে না? মানুষের নিত্য নতুন চেহারা দেখতে দেখতে আজ সে মশগুল হয়ে গেছে। মিঃ সর্বাধিকারীর কথা না হয় বাদই দিল। কেন মিস বিশ্বাস? এই বয়েসে কি কাণ্ডটাই করল?

মিস বিশ্বাসের কথা মনে হতেই ক্যাপ্টেন রায় হাসেন। হাসবেন না? সে তো এক মহাভারত! শেষ নেই তার কীর্তির, তার কাহিনির।

অশোকস্তম্ভ মার্কা সিগারেট কেস থেকে অশোকস্তম্ভ আঁকা বিলেতী কোম্পানির একটা সিগারেট বের করলেন। টেবিলের ওপাশ থেকে লাইটারটা টেনে নিয়ে জ্বালতে গিয়ে কি যেন ভাবলেন।

কি আর ভাববেন?

ভাবছিলেন ডায়মণ্ডহারবার রোডের সরকার বাড়ির কথা। আদিনাথ সরকার, দিবানাথ সরকার ও সতীনাথ সরকার। তিন ভাই। তিন রত্ন? মণিমাণিক্য হীরা-জহরত বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাংলাদেশের উর্বর জমিতে বিনা কসরতে ধান, পাট আর বিপ্লবী হতে পারে কিন্তু শিল্পপতি হওয়া দুর্লভ ব্যাপার। রাজস্থানের মরুভূমির প্রাণহীন, হৃদয়হীন বীজ, বাংলাদেশের জল হাওয়ায় শুধু বড়বাজারে নয় সর্বত্রই পল্লবিত হয় কিন্তু বাংলার বীজ ডালহৌসী-ক্লাইভ স্ট্রিটে পুঁতলেও কোনোদিন ফল ধরে না। বিধাতার এই নির্মম রসিকতাকে উপেক্ষা করে যে মুষ্টিমেয় কটি বাঙালি পরিবার লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করতে পেরেছেন, সরকার বাড়ি তার অন্যতম।

আদিনাথ তো সাক্ষাৎ দেবতা। চেহারাটা দেখলেই ভক্তি আসে। সেকালের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। ছাত্রজীবন শেষ করে পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রথমে ক্যানিং স্ট্রিট ও কলেজ স্ট্রিট। পরে মিশন রো। আরো পরে ব্রেবোর্ন রোড। হাজার। লাখ। কোটি। না জানি কত কোটি।

এখন বয়েস হয়েছে। টাকা পয়সা স্পর্শ করলে রামকৃষ্ণের মতো জ্বালা অনুভব না করলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। এখন সাধুসঙ্গ আর সৎ কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। পরলোকগতা স্ত্রী নীহারিকা দেবীর নামে কলকাতার উপকণ্ঠে 'নীহারিকা মাতৃসেবাসদনে' নিত্য কত নারীর সেবা হচ্ছে। কত সহায় সম্বলহীনার শিশু পৃথিবীর প্রথম আলো দেখছে এই মাতৃসেবাসদনে।

সিগারেট জ্বালতে গিয়ে লাইটারটা হাতে নিয়ে এত কথা মনে পড়ার কথা নয়। কিন্তু কি করবে ক্যাপ্টেন রায়? হিজ্ এক্সেলেন্সী জগৎপতি বাজপেয়ী পাঁচ পাঁচ বছরের দুটি টার্মে বাংলাদেশের গভর্নর থাকায় এই সরকার বাড়ির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ না হয়ে পারেনি।

ঠাকুরপুকুর ছাড়িয়ে বেশ কিছু এগিয়ে গেলে 'নীহারিকা মাতৃসেবাসদন'। মেটারনিটি আর জেনারেল ওয়ার্ড আগের থেকেই ছিল কিন্তু সার্জিক্যাল ওয়ার্ড না থাকায় বড়ই অসুবিধা হচ্ছিল। চটপট অপারেশন করলে যাঁদের বাঁচান যেত তাঁরাও পি-জি-তে যাবার পথে অ্যাম্বুলেন্স বা ট্যাক্সিতেই প্রাণ হারাতেন। আদিনাথবাবু মনে মনে বড় কষ্ট পেতেন। বছরের পর বছর নিঃশব্দে এই মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। ভাবতেন, হয়তো আশেপাশে সরকারি হাসপাতালে কিছু একটা ব্যবস্থা হবে। বছরের পর বছর অপেক্ষা করেও কিছু হল না। রাইটার্স বিল্ডিং-এ দরখাস্ত পাঠান হল নানা মহল থেকে। না, তবু অচলায়তন নড়ল না।

এম-এল-এ বিনোদবাবু যখন এসে বললেন, 'সামনের বছরের বাজেটে ইনক্লুড করার জন্য কত অনুরোধ করলাম কিন্তু তাও সম্ভব হল না।'

অচঞ্চল আদিনাথবাবু বললেন, 'আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। মার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে...'

মাস ছয়েক পরে বিনোদবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আদিনাথবাবু এলেন রাজভবনে। ক্যাপ্টেন রায়

সেদিন ডিউটিতে ছিলেন না। কিন্তু যেদিন সকালে 'নীহারিকা মাতৃ সেবাসদনে'র সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের ও অপারেশন থিয়েটারের ওপেনিং করতে গভর্নর গিয়েছিলেন, ক্যাপ্টেন রায় সেদিন ডিউটিতে ছিলেন।

সরকার বাড়ির সঙ্গে সেই তার প্রথম পরিচয়।

তারপর গত দশ বছরে কত শত অনুষ্ঠানে কত শতবার দেখা হয়েছে দিবানাথ ও সতীনাথ সরকারের সঙ্গে। শুধু দেখা সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় নয় সতীনাথের সঙ্গে আজ তাঁর গভীর বন্ধুত্ব।

এই সতীনাথই দিয়েছিল লাইটারটা। রনসনের বেস্ট কোয়ালিটি। আঙুল দেবার আগেই যেন জ্বলে ওঠে। সে আগুন বাড়ান যায়, কমান যায়। কখনো দপ্ করে জ্বলে, কখনও ধীরে ধীরে জ্বলে। দিনের আলোয় সে আগুনের শিখা নজরে পড়ে না অপরিচিতের চোখে।

লাইটারটা নিয়ে আরো একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার পর ক্যাপ্টেন রায় সিগারেট ধরালেন। এক গাল ধোঁয়া ছাড়লেন।

আবার নজর পড়ল লাইটারটার উপর। আপন মনেই মুচকি হাসল। এতো লাইটার নয়, যেন সতীনাথ সরকারের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করছে উপরটা। দেখে বুঝা যায় না, একটা আগ্নেয়গিরি। কল্পনা করা যায় না, এর ভেতর এত আগুন লুকিয়ে আছে। রনসন লাইটারের মতো সে আগুন দিনের আলোয় মিশে যায় কিন্তু সন্ধ্যার পর ফ্রি স্কুল স্ট্রিট আর পার্ক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটগুলোতে আলো জ্বলে উঠলে...

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই সতীনাথের চিন্তা কোথায় লুকিয়ে পড়ল। এনগেজমেন্ট ডায়েরির দিকে তাকাতে না তাকাতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

'এ-ডি-সি হিয়ার'।

মুহূর্তের জন্য ওপাশ থেকে কি যেন শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'সেন্ড হিম আপ।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন রায়। টেবিলের ওপাশ থেকে টুপিটা নিয়ে মাথায় দিলেন। ইউনিফর্মটা একটু টেনে টুনে ঠিক করে আর এক ঝলক ঘড়িটা দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বেয়ারা টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ক্যাপ্টেন রায় বললেন, 'নেক্সট্ ভিজিটার্স আসছেন।'

রাজভবনের বেয়ারা চাপরাশীদের একটু ইঙ্গিত করলেই কাজ হয়। তাছাড়া এরা এদের কাজকর্ম দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সরকারি দপ্তরখানায় আই-সি-এস সেক্রেটারিরা ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে হাঁপিয়ে যান কিন্তু বেয়ারাদের দর্শন পান না। যে হেড অ্যাসিসট্যান্ট সেক্সন অফিসারদের ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, সেই তাদের টেবিলের ঘণ্টাটা দেখবেন। ঠং ঠং করে বাজাতে বাজাতে ঘণ্টার মাথাগুলো বেঁকে তুবড়ে গেছে, হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বেয়ারা-চাপরাশীর দল নির্বিকার। একটু চেঁচামেচি হয়তো শুনতে হয়, তবে বেয়ারা-চাপরাশীর দল ওসব গ্রাহ্যই করে না।

রাজভবন সরকারি পয়সায় চললেও অনেকটা বড় বড় হোটেলের মতো। ইসারা-ইঙ্গিত ফিস-ফিসই বেশি।

রাজভবনকে হোটেল বললেও অন্যায় হবে না। ভি-আই-পি-র দল তো এখানেই আতিথ্য গ্রহণ করেন। কখনও স্বদেশি, কখনও বিদেশি। কেউ একদিন বা কেউ এক সপ্তাহের জন্য। পার্থক্য শুধু একটাই। ক্যাশিয়ার-একাউন্টেন্টের কাউন্টার এখানে নেই। আর নেই আগমন

নির্গমনের সময় ওই বিরাট লম্বা খাতায় দস্তখতের পর্ব। ছোটখাটো পার্থক্য আরো আছে।

বেয়ারাকে ভিজিটার আসার কথা বলেই ক্যাপ্টেন রায় এগিয়ে গিয়ে গভর্নরের ড্রইংরুমের দরজায় দু-একবার নক করেই ভেতরে গেলেন।

গভর্নর এ-ডি-সি-কে দেখেই বুঝলেন, পরবর্তী দর্শনার্থী হাজির।

মিঃ জগতিয়ানী গভর্নর সাহেবের দুহাত ধরে বিদায় নিয়ে ক্যাপ্টেন রায়ের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন।

করিডোরে এসে দুজনে হ্যান্ডসেক করলেন।

ক্যাপ্টেন রায় বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে বেশ লাগল।'

'ওসব ফর্মালিটি ছেড়ে দিন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় চলে আসুন আমার ভবানীপুরের বাড়িতে। তেলেভাজা মুড়ি খেতে খেতে আড্ডা দেওয়া যাবে আর আমার মেয়ের গান শুনে আসবেন।'

সিঁড়ির দিকে এগুতে এগুতে ক্যাপ্টেন রায় জিজ্ঞাসা করলেন. 'কি গান?'

'হিন্দী ফিল্মের গান না, পিওর বাংলা গান।'

'আচ্ছা।'

'আচ্ছা-টাচ্ছা নয়, একদিন আসুন।'

সিঁড়িতে পা দিয়ে মিঃ জগতিয়ানী পিছন ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'ভয় নেই, আমি ব্যবসাদার হলেও আপনাকে এক্সপ্লয়েট করব না।'

'না, না, ও কি বলছেন।'

মিঃ জগতিয়ানী বিদায় নিলেন। ক্যাপ্টেন রায় অফিসে আসতে না আসতেই পরবর্তী দর্শনার্থী মিস্টার আর কে চ্যাটার্জি এলেন।

ক্যাপ্টেন রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'গুডমর্নিং স্যার।'

'গুডমর্নিং।'

আবার বেয়ারার তলব। ছাপান স্লিপ গেল হিজ এক্সেলেন্সির কাছে। বেয়ারা ঘুরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

ক্যাপ্টেন রায় উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় টুপিটা দিয়ে এক পা এগিয়ে বললেন, 'ইয়েস স্যার, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড...'

আবার ড্রয়িংরুমের দরজায় দুবার নক করে ক্যাপ্টেন রায় ভিতরে গিয়ে বললেন, 'ইওর এক্সেলেন্সি! মিঃ আর কে চ্যাটার্জি ইজ হিয়ার।'

মিঃ চ্যাটার্জিকে এগিয়ে দিয়ে এ-ডি-সি পিছিয়ে এলেন। মাথাটা একটু নীচু করে বিদায় নিলেন গভর্নরের কাছ থেকে।

এ-ডি-সি সাহেব বেরুতে না বেরুতে বেয়ারা ট্রে-তে করে চা-স্ন্যাকস্ নিয়ে ঢুকল।

ক্যাপ্টেন রায় নিজের ঘরে ফিরে এসে টুপিটি খুলে চেয়ারে বসে আবার একটা সিগারেট খাবার জন্য সিগারেট কেস আর লাইটারটা তুলে নিলেন। একটু অন্যমনস্কভাবে লাইটারটা জ্বালাতে গিয়ে হঠাৎ দপ্ করে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। চারপাশে দরজা-জানলা খোলা। সূর্যের আলোয় ভরে আছে সারা ঘর। তবুও এমন বিশ্রীভাবে লাইটারটা জ্বলে উঠল যে চোখ দুটো যেন সহ্য করতে পারল না।

ক্যাপ্টেন রায়ের মনে পড়ল। হ্যাঁ, এই দিনের বেলাতেও সতীনাথ সরকার কখনও কখনও জ্বলে ওঠে। দপ করে জ্বলে ওঠে, দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ক্যাপ্টেন রায়ের মতো বন্ধুদের চোখগুলো সহ্য করতে পারে না।

প্রথম প্রথম কষ্ট হয়, অসহ্য মনে হতো ক্যাপ্টেনের। মনটা বিদ্রোহ করতে চাইত, সৈনিক হয়েও ধৈর্যচ্যুতি ঘটত কিন্তু মডার্ন সোসাইটির সৌজন্য বজায় রাখবার জন্য কিছু করতে পারত না। প্রায় মুখ বুজে সহ্য করত।

লাইটারের আগুনটা অমন দপ্ করে, দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠায় ক্যাপ্টেন মুখ সরিয়ে নিয়েছিলেন সিগারেটটা জ্বালাতে পারেননি। ফ্রেম কন্ট্রোলকে ঘুরিয়ে আবার লাইটারটা জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালেন ক্যাপ্টেন। প্রায় অদৃশ্য এক শিখা! মুহূর্তের জন্য বেশ লাগল দেখতে। শুধু যেন একটা ইঙ্গিত, একটা ইসারা। একটা নিমন্ত্রণ। একটা স্বপ্ন, একটা আশা। ভবিষ্যতের প্রত্যাশা।

মোগলের প্রাসাদ বা আলাউদ্দীন খিলজীর হারেমের অনতিদূরে বসে নয়। যমুনা পারে গুলবাহারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা পারস্য-সুন্দরীদের দেখতে দেখতেও নয়, ডালহৌসী পাড়ার রাজভবনে বসে বসেই ক্যাপ্টেন রায়ের মনটা যেন একটু চঞ্চল হয়। একটু বিচলিত হয়।

সরকারি বা বেসরকারি দপ্তরে বসে মন চঞ্চল হতে পারে না। চারপাশে লোকজন গিজ গিজ করছে। বক্ বক্ করতে হয় সারাক্ষণ। তাছাড়া পরিবেশ।

রাজভবনে তো সে বালাই নেই। এ-ডি-সি-র অফিস থেকে জানলা দিয়ে দেখা যায় ফুলের জলসা, সবুজের মেলা।

আর?

আর দেখা যায় দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ। দুটো ডানায় ভর দিয়ে উড়ে বেড়ায় ছোট্ট ছোট্ট পাখি। কতটুকুই বা ওদের প্রাণশক্তি? কতটুকুই বা সামর্থ্য? তবুও স্বপ্ন দেখার শেষ নেই। অফুরন্ত ওদের সাধ। উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়ায় সীমাহীন নীল আকাশের বুকে।

রাজভবনে ওই দপ্তরে বসে নীল আকাশ দেখতে দেখতে ক্যাপ্টেনও উড়ে ঘুরে বেড়ান দিগন্ত বিস্তৃত পরিচিতের মহাকাশে। এ যেন সেই 'পথ হারানোর অধীন টানে অকূলে পথ আপনি টানে।'

সিগারেটে একটা টান দেন। একবার লাইটার দেখেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দৃষ্টিটা ঘুরে আসে ফুলের জলসায়, সবুজের মেলায়, নীল আকাশের কোলে।

পর পর দুটো টান দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরিয়ে দিলেন ঘরটা, এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন কমল রায়। রিভলবিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে একটা টি-পাই এর ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলেন।

কি ভাবছিলেন কে জানে? হয়তো সতীনাথবাবুর কথা। হয়তো বিভ্রান্ত মন চাইছিল মণিকার আশ্রয়। হয়তো বা অন্য কিছু, অন্য কাউকে!

হঠাৎ লাল আলোর ঝলকানি অনুভব করতেই মুহূর্তের মধ্যে মাথায় টুপি চাপিয়ে এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন রায় ছুটে গেলেন গভর্নরের কাছে।

মর্নিং ভিজিটার্স চলে যাবার পর রাজভবনের প্রথম অধিবেশন শেষ হয়। খুব জরুরী কাজ থাকলে অবশ্য রাজ্যপালকে পাঁচ-দশ মিনিট আরো থাকতে হয়। জরুরী কাজ মানে কয়েকটা দস্তখত। অটোগ্রাফ। নিজের বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনা—কিছুরই প্রয়োজন নেই। কোনো চিন্তাভাবনা না করেই রাজ্যপালকে অর্ডিন্যান্স বা বিল বা অন্য কোনো দলিলে দস্তখত দিতে হয়।

এমন ধরনের জরুরী কাগজপত্রে রাজ্যপালের দস্তখত দরকার হলে মর্নিং ভিজিটার্স চলে যাবার পর সেক্রেটারি টু দি গভর্নর নিয়ে আসেন এইসব কাগজপত্র। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই রাজ্যপালের বিবেচনার পর্ব শেষ হয়। তারপর দস্তখত। অটোগ্রাফ।

গভর্নর অন্দরমহলে প্রস্থান করলে রাজভবনের প্রাণহীন নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ হয়।

এ-ডি-সি ফিরে আসেন নিজের অফিসে। রিভলবিং চেয়ারে দেহটা এলিয়ে পা দুটো তুলে দেন টেবিলের ওপরে। অশোকস্তম্ভ মার্কা সিগারেট ধরিয়ে ভর্তি করে দেন ঘরটা।

দুটো একটা টান দিতে না দিতেই পিছনের ওই বিরাট জানলা দিয়ে একটা দমকা হাওয়া আসে। সিগারেটের ধোঁয়া কোথায় হারিয়ে যায়, লুকিয়ে যায় ক্যাপ্টেন রায় তা নিজেই বুঝতে পারেন না। হাতের রনসন লাইটারটা বড় স্পষ্ট করে দেখতে পান।

ইতিমধ্যে বুড়ো রমজান এসে গেছে। রোজ যেমন আসে। এক পট দার্জিলিং টি, কিছু স্ন্যাকস্, কিছু পেস্ট্রি, কিছু নাটস্ নিয়ে। রমজান আপন মনে এক কাপ চা তৈরি করে এগিয়ে দেয় ক্যাপ্টেন রায়ের সামনে। 'লিজিয়ে সাব, চা খান।'

লাইটারটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সম্বিত ফিরে পান আনমনা ক্যাপ্টেন রায়। রমজানের কথা শুনে একটু মুচকি হাসেন।

'কিঁউ সাব? হাসেন কেন?' রমজান জানতে চায়।

সাধারণ বেয়ারা-চাপরাশীর দল অফিসারদের সঙ্গে ঠিক এভাবে কথা বলার সাহস বা প্রশ্রয় না পেলেও রাজভবনে এসব সম্ভব। এখানে বেয়ারা চাপরাশীরা যে বড় বেশি ঘনিষ্ঠ। বড় বেশি কাছের মানুষ। দু চোখ ভরে ওরা যে সবকিছু দেখেছে। মুখে কিছু বলে না, বলতে পারে না, বলতে চায় না। কিন্তু মনে মনে তো সবকিছু জানে, বোঝে।

তাছাড়া রমজানের কথা স্বতন্ত্র। রিটায়ার করার পর দু-দুবার এক্সটেনশন পেয়েছে স্বয়ং গভর্নরের সুপারিশে। রমজানের কনিষ্ঠ সহকর্মীরাও আপত্তি করেনি। বরং তাদেরই সম্মিলিত অনুরোধে রমজানের চাকরির মেয়াদ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। হয়তো ভবিষ্যতেও হবে।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে রমজান কাজ করছে এই রাজভবনে। নিজের হাতে কাজ শিখিয়েছে তার সব তরুণ সহকর্মীদের। ওদের সবাইকে পুত্রতুল্য জ্ঞান করে প্রবীণ রমজান। রমজান রাজভবনের প্রধানতম কর্মী। সবার কাছেই ওর বিশেষ মর্যাদা।

তাইতো এ-ডি-সি সাহেবের মুচকি হাসি দেখে রমজান তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারে।

ক্যাপ্টেন রায় জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা রমজান তুমি তো প্রায় তিরিশ-চল্লিশ বছর এই কলকাতা শহরের এই রাজভবনে কাটালে—'

'হাঁ সাব, করিব তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর হবে বৈকি।'

'তবে তুমি বাংলা বলতে পার না কেন?'

হাসতে হাসতে রমজান বলে, 'এহি বাত সাব?'

রমজান হারিয়ে যায় সেই সুদূর অতীতে। স্কুল-কলেজের কিছু ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় পাশ করার জন্য সেসব দিনের দুচার পাতা ইতিহাস মুখস্থ করলেও আর সবাই ভুলে গেছে। কলকাতা শহরের রাস্তা থেকে মুছে গেছে সেসব দিনের স্মৃতি। সেদিনের এসপ্লানেড, হেস্টিংস, ডালহৌসীর চরিত্র চেহারা হারিয়ে গেছে। কলকাতার মানুষ ভুলে গেছে কারমাইকেল, রোনাল্ডসে, স্টেইনলি, জ্যাকসন, অ্যান্ডারসন, ব্রেবোর্নের কথা।

রমজান যেন ক্যাপ্টেন রায়ের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রাজভবনটা পুরো একটা চক্কর দিয়ে আসে। কুর্নিস করে আসে রোনাল্ডসে, স্টেইনলি জ্যাকসন, অ্যান্ডারসনকে।

'সাব, বাংলা জানে বৈকি! তবে আমি তো পুরান জমানার লোক। আংরেজি ছাড়া আর কিছু চলত না এই গভর্নমেন্ট হাউসে।'

ফর্ক দিয়ে এক টুকরো রুটি মুখে পুরে ক্যাপ্টেন রায় রমজানের কথা শোনেন। একটু যেন অবাক হয়েই পুরান জমানার কথা শোনেন।

'ক্যাপ্টেন সাব, আমি যখন ছোকরা বয়েসে নোকরিতে ঢুকি, তখন বাঙালিবাবুরা এই গভর্নমেন্ট হাউসে ঢুকতে পেত না...'

'কেন যাঁরা গভর্নমেন্ট হাউসের অফিসেই কাজ করতেন?'

'না, তাঁরাও না। সাধারণ বাঙালি কেরানীবাবুরাও অন্দরে আসতে পারতেন না। কার্জন সাহেবের আমলে বাংলা দুটুকরা করার সময় যে মুভমেন্ট হল, তাতে আংরেজদের বড় ডর লেগেছিল। বাঙালি পুলিশ পর্যন্ত এই গভর্নমেন্ট হাউসে ডিউটি দিতে পারত না।'

'আচ্ছা?'

'জি সাব।'

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিতে দিতে ক্যাপ্টেন রায় জানতে চাইলেন, 'তুমি চাকরি পেলে কি ভাবে?'

'সে তো আর এক কাহানি। তবে তখন আপকান্ট্রি মুসলমানদের নোকরি মিলত। আমার এক চাচা জ্যাকসন সাহেবের এক দোস্তের খাস বেয়ারা ছিল। সেই সাহেবের দয়াতেই আমি ছোকরা বয়সে গভর্নমেন্ট হাউসে নোকরি পাই।'

ভারি মজা লাগে রমজানের কথা শুনতে। 'তা তুমি ছোকরা বয়সে কি কাজ করতে?'

'এই কলকাত্তা শহরের বড় বড় সাহাবদের মেমসাহেবদের দল রোজ সকালে হেস্টিংসের মাঠে গল্‌ফ খেলতে যেতেন। কোনো কোনোদিন লাটসাহেবের মেমসাহেবও যেতেন। আমি যেতাম মেম-সাহেবদের সঙ্গে বল কুড়িয়ে দেবার জন্য।

কথাগুলো বলতে বলতে রমজানের চোখমুখগুলো একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেন একটু গর্ব হয় সেদিনের স্মৃতি রোম-হন করতে।

'মেমসাহেব আমাকে খুব পসন্দ করতেন...'

আর এক পেয়ালা চা শেষ করে ক্যাপ্টেন রায় প্রশ্ন করেন, 'কেন?'

রমজান হঠাৎ একটু হাসে। একটু যেন জোরেই হাসে। রাজভবনের শান্ত শীতল, প্রাণহীন পরিবেশে সে হাসি যেন বেমানান।

ক্যাপ্টেন একটু বিস্মিত না হয়ে পারেন না। 'কি ব্যাপার, হাসছ কেন?'

'বড় মজা হতো ও জমানায়। রোজ সন্ধ্যার পর খানা-পিনার পার্টি হতো। এই কলকাতার সব বড় বড় সাহেবরা আসতেন দিল্লি, বিলাইতের সাহেবরাও আসতেন। নাচ, গান আর শরাব চলত রাত একটা, দুটো, তিনটা পর্যন্ত...'

'রোজ হতো?"

'হ্যাঁ সাব, রোজ। এখনকার মতো তখন লাটসাহেব রোজ লেকচার দিতে বাইরে যেতেন না। লাটসাহেব সাল মে দো-চোর বাইরে খানাপিনা করতেন। বাকি রোজ সন্ধ্যায় লাটসাহেবেই অন্যদের খানাপিনার পার্টি দিতেন। আর ওইসব পার্টিতে কি ভয়ানক বদমাইশি হতো...'

ক্যাপ্টেন রায়ের আগ্রহ বাড়ে, 'কেন? পার্টিতে আবার কি বদমাইশি হতো?'

ডান হাতটা কপালে ঠেকিয়ে বৃদ্ধ রমজান বলে, 'আরে সাব! মাত পুছিয়ে। বোতল বোতল শরাব খাবার পর কি আর হুঁশ থাকে? সাহেব-মেমসাহেবরা বেহুঁশ হবার পর বদমাইশি হতো।'

রমজান একটু থেমে আবার ঠিক করে মনে করে নেয়।

'সাহাব-মেমসাহাবের দল বেহুঁশ হবার পর বেয়ারা-চাপরাশীরা মজা শুরু করত। কেউ শরাব খেত, কেউ চোরি করত, কেউ আবার...'

রমজান আর এগোতে পারে না। বলতেও দ্বিধা হয়, সঙ্কোচ হয়। লজ্জাও করে ঘৃণাও করে।

ক্যাপ্টেন রায়ের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

'তা মেমসাহেব তোমাকে কেন ভালোবাসতেন?'

'আমি ছোকরা ছিলাম বলে ওদের চোরি করাতে আমার ডর লাগত, খারাপ লাগত। পারলে ওদের চোরির জিনিস আমি ফিরিয়ে দিতাম। মেমসাহেবকে সাবধান করে দিতাম। তাইতো...'

শুধু সেদিন সকালে নয় আরো কতদিন বসে বসে এই গভর্নমেন্ট হাউসের কত কাহিনি শোনেন ক্যাপ্টেন রায়। আজকের রাজভবনের সঙ্গে সেদিনের গর্ভনমেন্ট হাউসের কত পার্থক্য। এক যুগ নয়, বহু যুগের ব্যবধান। ইউনিয়ন জ্যাক থেকে তেরঙ্গা। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনন্য স্মৃতি লুকিয়ে আছে এই রাজভবনের সর্বত্র। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরদের সঙ্গে লর্ড ওয়েলেসলির ঐতিহাসিক ঝগড়া হয় রাজভবনে। মেকলের সঙ্গে বেন্টিক-এর বির্তক হয় ওই পাশের কাউন্সিল চেম্বারে।

রমজান তখন গভর্নমেন্ট হাউসে চাকরি পায়নি, তবে শুনেছে। অনেকের কাছে শুনেছে। শুনেছে লর্ড ক্যানিং-এর কাহিনি। স্বেচ্ছাচারী ক্যানিং যখন এই গভর্নমেন্ট হাউসে ছিলেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে ঝড় উঠেছিল। কলকাতার ইংরেজরা ওই ওপাশের টাউন হলে বসে সভা করে দাবি জানিয়েছে, 'গো ব্যাক ক্যানিং'। পরবর্তীকালে আই-সি-এস লরেন্স লর্ড লরেন্স হয়ে গভর্নর জেনারেল হলে এই গভর্নমেন্ট হাউসের লনে ক্রিকেট খেলেছেন আর কলকাতার হাজার হাজার মানুষ সে খেলা দেখে হাততালি দিয়েছে শীতকালের দুপুরে।

'ক্যাপ্টেন সাব, কি হয়নি এই গভর্নমেন্ট হাউসে। অ্যান্ডারসন সাহাব যখন লাটসাহেব তখন তাঁর মেয়েকে লিয়ে কি গড়বড়ই না হল।'

'কি হয়েছিল?'

'কি হয়নি তাই বলুন। সুইসাইড পর্যন্ত হয়ে গেছে ওই লেড়কির জন্য।'

'কই তাতো কখনো শুনিনি।'

'এই রমজান ছাড়া আর কেসে কাহিনি বলবে বলুন। আমার চোখের সামনে হয়েছে...'

জ্যাকসনের পর বাংলার গভর্নর হয়ে এলেন স্যার জন অ্যান্ডারসন। সঙ্গে এলেন লেডি অ্যান্ডারসন ও তাঁর দুই মেয়ে। ছেলেটি পড়াশোনার জন্য বিলেতেই রইল। মেয়ে দুটির নাম রমজানের মনে নেই। ঠিক বয়স কত ছিল তাও মনে নেই। তবে মনে আছে মেয়ে দুটি সুন্দরী ও শিক্ষিতা ছিল এবং ওদের নিয়ে গভর্নমেন্ট হাউসের অফিসারদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

স্যার জন যখন কলকাতা এলেন, তখন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মোড় ঘুরেছে। ডালহৌসী বা ক্যানিং-এর যুগ বহুদিন আগে শেষ হয়েছে। রাউলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ, খিলাফত আন্দোলন, এক প্রস্থ অসহযোগ আন্দোলনের ঝড় বয়ে গেছে ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে। গুলি-গোলা, বোমা-পটকাও শুরু হয়েছে নানা দিকে। বাংলাদেশ তখন টগবগ্ করে ফুটছে। অ্যান্ডারসন সাহেবকে তাই গভর্নমেন্ট হাউসে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারি কাজে মন দিতে হল। মিলিটারি আর পুলিশ অফিসারদের নিয়ে বসতে হতো রোজ সকালে। ঘন ঘন দিল্লীতেও যেতে হতো শলা-পরামর্শের জন্যে।

চাকরি করতে এসে কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন এই স্যার জন অ্যান্ডারসন। চব্বিশ ঘণ্টা সন্ত্রাসবাদীদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত থাকতেন। গভর্নমেন্ট হাউসের বাইরে বেরুতেন না বিশেষ। লেডি অ্যান্ডারসনও স্বামীর জন্য বড়ই চিন্তিত থাকতেন। তাইতো স্বামীর সান্নিধ্য তিনি বিশেষ ত্যাগ করতেন না।

মাঝখান থেকে বিপদে পড়ল মেয়ে দুটি। বিলেত থেকে সদ্য আগতা যুবতী মেয়েদের পক্ষে ওই গভর্নমেন্ট হাউসের মধ্যে বন্দিনী থাকা বিশেষ আনন্দের নয়। কদিন পরেই ওরা ছটফট করতে শুরু করল। লেডি অ্যান্ডারসন দু-চারদিন গঙ্গার ধার, ফোর্ট উইলিয়াম আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখবার পর মেয়েদের বললেন 'এই শহরে আর যেদিকে যাবে, সেখানেই টেরোরিস্টে ভর্তি। তাছাড়া ডার্টি সিটি! কি আর দেখবে?'

মেয়ে দুটি কিন্তু ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারল না। একদিন সুযোগ সুবিধা মতো লাঞ্চের সময় একেবারে খোদ মিলিটারি সেক্রেটারিকে ওরা জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা একটু বাইরে ঘোরাঘুরি করতে পারি না?'

'কেন পারবে না?' কর্নেল উত্তর দেন।

'ওই যে মা বললেন চারপাশে টেরোরিস্ট...'

কর্নেল সাহেব হেসে বললেন, 'না, না, তোমাদের ওসব ভয় নেই। তবে গভর্নমেন্ট হাউসের গাড়ি চড়ে, পুলিশ নিয়ে ঘোরাঘুরি করলে বিপদ আছে। সাধারণ মেয়েদের মতো ঘুরলে কেউ কিচ্ছু বলবে না। বরং ইউ কান্ট গেট এ মোর ফ্রেন্ডলি প্লেস দ্যান দিস সিটি!'

রমজান বলল, 'ব্যাস! উসকে বাদ লেড়কিদের আর গভর্নমেন্ট হাউসে দেখাই যেতো না। কোনোদিন লাঞ্চ খেতেন না, কোনোদিন ডিনার খেতেন না। আবার কোনো কোনো দিন পিকচার দেখে রাত বারোটার পরে গভর্নমেন্ট হাউসে ফিরতেন।'

ক্যাপ্টেন রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা একলা একলাই ঘুরে বেড়াত?'

রমজান হেসে ফেলে, 'আরে সাব, জোয়ান লেড়কি কভি আকেলে আকেলে ঘোরাঘুরি করে?'

প্রবাসী বাঙালি হলেও বাঙালি তো বটে। বাংলাদেশের ইতিহাস পুরোটা না জানলেও কিছু কিছু তো জানেন ক্যাপ্টেন রায়। কিছু পড়েছেন কিছু শুনেছেন। স্যার জন অ্যান্ডারসনের নাম তাঁর কাছে অজ্ঞাত নয়।

হাজার হোক এলাহাবাদের ছেলে। মেদিনীপুর, ঢাকা, কুমিল্লা থেকে অনেক দূর। তবুও যে বাংলা, পাঞ্জাব আর মহারাষ্ট্র ইংরেজ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ ধরে টান দিয়েছিল সেই অগ্নিক্ষরা দিনগুলিতে এলাহাবাদ ছিল তাদের কেন্দ্রবিন্দু। মিলনক্ষেত্র। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর পুণ্য সঙ্গম এই এলাহাবাদ। ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের প্রয়াগ তীর্থ। আধুনিক ভারততীর্থের পুণ্যভূমি। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মর্মস্থল।

স্যার স্টেইনলি জ্যাকসনের নামটা ঠিক মনে না থাকলে অ্যান্ডারসন সাহেবের নাম বেশ মনে আছে। তিরিশের বাংলাদেশ—বিপ্লবের ভরা যৌবন! সেদিনের কাহিনিতে অ্যান্ডরসন সাহেবের বার বার উল্লেখ 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতীদের বার বার নজর পড়ছে এই ঘৃণা নায়কের দিকে।

রমজান অত শত জানে না, বুঝে না। তবে সে জানে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে অ্যান্ডারসন সাহেবের মনের আগুন, অন্তরের জ্বালা।

'অ্যান্ডারসন সাহেবের বড় গুস্‌সা ছিল। এই আপনাদের বাঙালিদের উনি বরদাস্ত করতে পারতেন না।'

ক্যাপ্টেন রায় ছোট্ট প্রশ্ন করেন 'কেন?'

রমজান আবার বলে, 'এখনকার মতো তখন হিন্দী বা উর্দু আখবার পাওয়া যেত না। আংরেজি পেপারই শুধু গভর্নমেন্ট হাউসে থাকত। তাছাড়া আমাদের পেপার পড়ার পারমিশান ভি ছিল না।'

'আচ্ছা?' অবাক হন এ-ডি-সি।

'অর কিয়া?' রমজান একটু হাসে। 'আমি কি এমনি এমনি বলি জামানা বদলে গেছে? জামানা বহুত বদল গ্যায়া সাব!'

খবরের কাগজ পড়তে পারত না রমজানের দল। তবুও খবর পৌঁছে যেত ওদের কাছে। পাষাণে গাঁথা পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে যেমন চুঁইয়ে চুঁইয়ে বিন্দু বিন্দু জল বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনি করে গভর্নমেন্ট অফিসের সতর্ক দৃষ্টির অজ্ঞাতসারেই আসত মেদিনীপুর, ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রামের খবর। খবর আসত পাঞ্জাব থেকে, মহারাষ্ট্র থেকে ; এই কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউসে বসেই শোনা গিয়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের সর্বনাশা কাহিনি। বড় বড় রাজকর্মচারীর ফিস ফিস করে আলোচনা করত পাঞ্জাবের গভর্নর মাইকেল ও ডায়ার ও তাঁর সহচর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হ্যারি ডায়ারের কীর্তি। অমর কীর্তি! বিশ্ববিশ্রুত কীর্তি।

'সরি! সেদিন আমার কাছে সাড়ে বারোশ রাউন্ড গুলির একটাও অবশিষ্ট ছিল না। যদি থাকত, নিশ্চয়ই সদ্ব্যবহার করতাম।'

জেনারেল ডায়ার দুঃখ করে আরো বলেছিলেন, 'গলিটা বড় সরু ছিল বলে মেসিনগান দুটো ভিতরে নেওয়া যায়নি। ও দুটো ভিতরে নিতে পারলে বড় খুশি হতাম!'

এরাই হচ্ছে স্যার জন অ্যান্ডারসনের পথিকৃত। মনে মনে বোধহয় ইনিও স্বপ্ন দেখতেন বিলেতের কাগজে বীরপুরুষ জেনারেল ডায়ারের মতো তাঁরও ছবি ছাপা হয়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ কীর্তির মহানায়ক এই জেনারেলকে বিলেতের লোক কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পঁচিশ-ছাব্বিশ হাজার পাউন্ডের এক তহবিল পুরস্কার দিয়েছিল। অ্যান্ডারসন বোধহয় দেশবাসীর কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের তহবিল আশা করেছিলেন।

'জানেন ক্যাপ্টেন সাহেব, লাটসাব একদম উন্মাদ হয়েছিলেন। তাছাড়া মেদিনীপুরে হরদম আংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে মেরে ফেলার জন্য কলকাতার আংরেজরাও বড় ক্ষেপে উঠেছিল।'

এমন গুরুত্বপূর্ণ কাহিনি বলতে বলতেও বুড়ো রমজান ফিক্ করে একটু হাসে। বলে, 'একদিন ওই পিছনের বাগানে বেড়াবার সময় লাটসাব মেমসাবকে একটা গাছের ছায়া দেখিয়ে বললেন, ছায়াটা ঠিক মেদিনীপুরের ম্যাপের মতো!'

'সব সময় ওই এক চিন্তা! মেদিনীপুর!'

'সাহেবের অফিস কামারায় সামনে ছিল ওই মেদিনীপুরের ম্যাপ আর পিছনে থাকত বাংলাদেশের ম্যাপ।'

ইংরেজ অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এই স্যার জন অ্যান্ডারসনকে পাঠিয়েছিল বাংলাদেশে। বোধহয় পঞ্চ নদীর পুণ্যতীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগের পুনরাবৃত্তি চেয়েছিলেন বাংলাদেশে। কর্ণফুলি, বুড়িগঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, ভাগীরথীর বাংলাদেশে!

ডালহৌসীর গভর্নমেন্ট হাউসের এই নব নায়ক আগে ছিলেন ইমন ডি ভ্যালেরার আয়ারল্যান্ডে। সিন-ফিন মুভমেন্টের জন্য ইংরেজ শাসকদের অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করতে

হচ্ছিল। তাই তারা পাঠিয়েছিলেন স্যার জনকে।

জার্মানদের সহযোগিতায় স্বাধীনতাকামী আইরিশরা শুরু করেছিলেন সিন-ফিন আন্দোলন। এদের শায়েস্তা করার জন্য অ্যান্ডারসন সৃষ্টি করেছিলেন কুখ্যাত ব্ল্যাক এন্ড ট্যানস্ ইংরেজ পুলিশ বাহিনী! ওদের অত্যাচারের কাহিনি শুনলে গা শিউরে উঠবে।

অ্যান্ডারসন সাহেব বাংলাদেশে এসে গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো করতে চেয়েছিলেন। বাঙালি দিয়ে বাঙালিকে শায়েস্তা করার জন্য জন্ম নিল ভিলেজ গার্ডস্!

দিন রাত্তির চব্বিশ ঘণ্টা ওই এক চিন্তায় মেতে থাকতেন অ্যান্ডারসন। মেদিনীপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম! নিজেদের মেয়েদের চাইতে প্রিয় ছিল আর্মি আর পুলিশ অফিসাররা। ওরাই ছিল স্যার জনের প্রিয় সহচর। বন্ধু, আত্মীয়, পরমাত্মীয়!

এখনকার মতো তখন এই গভর্নমেন্ট হাউসের শুধু নর্থ গেটেই পুলিশ প্রহরী থাকত না। নর্থ, সাউথ, ইস্ট, ওয়েস্ট—সব গেটেই থাকত পুলিশ। সশস্ত্র পুলিশ। আরো পার্থক্য ছিল। এখন হিজ একসেলেন্সির দ্বাররক্ষক হচ্ছেন একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও জনা কয়েক কনস্টেবল। হিজ একসেলেন্টসি ইজ্জত বাঁচাবার জন্য মাঝে দেখা যাবে একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সার্জেন্টকে। দিল্লী থেকে লাটসাহেবের 'বস' গেলে অবশ্য অর্থহীন ঝাণ্ডা হাতে নেওয়া ঘোড়সওয়ার পুলিশ দেখা যায়।

আর তখনকার দিনে? স্যার জন অ্যান্ডারসনের আমলে? চার ফটকে পুলিশ। ডজন ডজন পুলিশ। বেছে নেওয়া হিংস্র প্রকৃতির কিছু কনস্টেবল, দেশি সব ইন্সপেক্টর, অ্যাংলো অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। এ ছাড়া থাকত আর্মড পুলিশ। চারপাশে ঘোরাঘুরি করত গোয়েন্দা।

এখন তো রাজভবনের চারপাশের ফুটপাতে হকার বসে, দেওয়ালে পসার সাজায়। ছআনায় গেঞ্জি, আট আনার তিনটি রুমাল, সস্তায় বেনারসী পেয়ারা ও ভাগ্যগণনা করাবার জন্য আশে পাশের অফিসের বাবুরা তো এখন রাজভবনের ফুটপাতেই আসেন। শুধু বাবুরা কেন? লুকিয়ে চুরিয়ে হয়তো লাটসাহেবের বৌ বা বৌমাও আসেন।

বাংলার তখৎ-এ-তাউসে যখন এই কুখ্যাত অ্যান্ডারসন আসীন, তখন ইন্ডিয়ান মাছি-মশা পর্যন্ত গভর্নমেন্ট হাউসের চৌহদ্দিতে আসতে পারত না।

'লেড়কি দুজন প্রথম প্রথম লাটসাহেবের কোনো পার্সোনাল আংরেজ অফিসারকে নিয়ে বাইরে যেতেন। এক, দো, ঘণ্টার জন্য। কিন্তু ওতে কি ওরা খুশি হয়?'

কথাটা বলে রমজান একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

গভর্নমেন্ট হাউসে নিত্য যেসব স্থানীয় ইংরেজরা আসা-যাওয়া করতেন, তাদের সঙ্গে মেয়ে দুটির খাতির শুরু হল।

সন্ধের আগে দুটি উন্মনা পাখি ঘরে ফিরে আসত সত্য কিন্তু প্রতীক্ষা করত ককটেল বা ডিনারের গেস্টদের জন্য।

হুইস্কির গেলাসটা চট পট ডান থেকে বাঁ হাতে নিয়ে মিঃ জেফারসন মাথাটা একটু নীচু করে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন, 'ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ, মিস অ্যান্ডারসন।' মিস অ্যান্ডারসন খুশি হয়ে একটু যেন হাসেন। ডান হাতটা এগিয়ে দিয়ে হ্যান্ডসেক করেন, গ্ল্যাড টু মিট ইউ।'

জেফারসন বড় খুশি হন। মিস অ্যান্ডারসনের হাতে গেলাস না দেখে উৎকণ্ঠিত হন ; 'হোয়াট অ্যাবাউট ইওর ড্রিংকস?'

'কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, আমি নেব এখন।'

'তাই কি হয়?'

জেফারসন আর কথা না বলে থ্রোন রুমের ওই বিরাট পার্টির মধ্যে হারিয়ে যান! আবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুহাতে দুটি গেলাস নিয়ে হাজির হন অ্যান্ডারসনের সামনে।

দুটি গেলাস দেখে মিস অ্যান্ডারসনের বেশ মজা লাগে! 'কি ব্যাপার দুটি গেলাস?'

'স্যাম্পেন এন্ড ফ্রেঞ্চ ওয়াইন। জানি না আপনি কোনটা পছন্দ করবেন। তাই দুটোই...'

লোকটা তো বেশ মজার। মিস অ্যান্ডারসন মুহূর্তের জন্য ভাবেন।

'কিন্তু হুইস্কি আনলেন না যে?'

'জেনারেলি...'

জেফারসন বলতে গিয়েও যেন দ্বিধা করেন।

'জেনারেলি কি?'

'সুড আই সে?'

মিস অ্যান্ডারসনের আরো মজা লাগে। 'কাম অন! আমার বাবা গভর্নর, আমি নই। আই অ্যাম জাস্ট এ ইয়ং গার্ল লাইক অল আদার ইংলিশ গার্লস।'

'এক্সকিউজ মী। তাহলে বলছি।'

'একশোবার বলুন। ইউ ক্যান সে এনিথিং ইউ লাইক।'

পাশের টিপাই থেকে নিজের হুইস্কির গেলাসটা তুলে এক চুমুকে দেন। যেন দ্বিধা সঙ্কোচের জন্য গলা দিয়ে কথাটা বেরুচ্ছিল না, তা বোধ হয় পরিষ্কার হয়!

'জেনারেলি সাধারণ মেয়েরা ওয়াইন খায় আর রোমান্টিক মেয়েরা স্যাম্পেন খায়। তাই...'

মিস অ্যান্ডারসনের মুচকি হাসিটা আর লুকিয়ে থাকে না, প্রকাশ হয়ে পড়ে। 'সো হোয়াট?'

'আই ডোন্ট নো আপনি কি ধরনের মেয়ে। তাই দুটো গেলাসই...'

পরিতৃপ্তির হাসিতে অ্যা ডারসন-নন্দিনীর সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'আই অ্যাম অ্যাফ্রেড ইভন আফটার দিস আমি আর ওয়াইন খেতে পারি না।'

'ওয়ান্ডারফুল!'

মিঃ জেফারসন স্যাম্পেনের গেলাসটা তুলে দিলেন ওর হাতে।

দুজনের হাতের দুটি গ্লাস এগিয়ে এল কাছে; একেবারে নিবিড় হবার পর ক্ষণিকের জন্য স্পর্শ হল দুটি গেলাসে।

'চিয়ার্স!'

'চিয়ার্স!'

এই হল শুধু। একটি অধ্যায়ের শুরু। একটি কাহিনির শুরু।

রমজানের কি সব মনে আছে? বিশ পঁচিশ বছর আগেকার কথা কি মনে থাকে? মনে আছে জেফারসন সাহেবও নতুন বিলেত থেকে এসে একটা বড় বিলেতি কোম্পানির বড় অফিসার ছিলেন। তবে রমজান জানে না উনি শৈশব, কৈশোর কাটিয়েছেন এডিনবরায়, যৌবনে পড়াশুনা করেছেন কিংস কলেজে। কলেজ থেকে বেরুবার পর ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে বা কলোনিয়াল সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা দেবার কথা ভেবেছিলেন, তাও রমজান জানে না। কি দরকার ওসব জানার।

'ওই সাহেবের দপ্তর ছিল ডালহৌসি স্কোয়ারের ওই কোণায় আর থাকতেন বেঙ্গল ক্লাবে।'

বুড়ো রমজান ঠিক বলছে তো? ক্যাপ্টেন রায় একটু জেরা করেন, 'ওই সাহেব কোথায় থাকতেন কোথায় চাকরি করতেন, তা তুমি জানলে কেমন করে?'

রমজান এ-ডি-সি সাহেবের কথা শুনে হাসে। 'আরে সাব, আমি জানবো নাতো কে জানবে?

আমাকে যে ডিউটি দিতে হতো। সকালে, সন্ধেয়, রাত্তিরে।'

'তার মানে?'

'প্রথম প্রথম লাটসাহেবের কোনো পার্সোন্যাল অফিসার সঙ্গে থাকলেও পরবর্তীকালে একজন বেয়ারা-চাপরাশীকে নিয়েই ওঁরা ঘোরাঘুরি করতেন। সাদা পোশাকে। তাছাড়া গভর্নমেন্ট হাউসের ক্লাউন মার্কা রোলস্ রয়েস বা ফোর্ড গাড়ি চড়ে নয়, সাধারণ ছোট গাড়ি চড়েই ওঁরা ঘুরতেন।'

ক্যাপ্টেন রায় আবার প্রশ্ন করেন, 'কেন?'

'কেন আবার?' তখনকার দিনকাল কি ছিল, তা জানা নেই? গভর্নমেন্ট হাউসের গাড়ি দেখলে কোথা থেকে কে বোমা মেরে দেবে, তার কি কোনো ঠিকানা ছিল? তাইতো খোদ মিলিটারি সেক্রেটারি পরামর্শ দিয়েছিলেন, তোমরা ঘোরাফেরা করতে চাও, কোনো আপত্তি নেই। বাট ইউ মাস্ট মুভ অ্যারাউন্ড লাইক কমোনার্স।

নিছক সাধারণ ইংলিশ গার্লের মতো ঘোরাঘুরি করলে বিপদ নেই বলেই সাধারণ গাড়ি আর সাদা পোশাকের চাপরাশী-বেয়ারার ব্যবস্থা হল।

'ক্যাপ্টেনসাব, বিশওয়াশ করুন কভি কভি বেঙ্গল ক্লাব থেকে ঐহি ছোকরী রাত দুতিন বাজে ফিরত।'

'এতক্ষণ...'

'আরে সাব, নাচ-গান, খানা-পিনা আউর কত কি চলত, কে জানে।'

বেশি দূর যাবার দরকার নেই। আমাদের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। ভালো-মন্দ, হাসি-কান্না, অতীত বর্তমানের সব কিছু মাল-মশলাই পাওয়া যাবে। দৃষ্টিটা একটু চারপাশে ঘোরালেই হয়। কিন্তু এই দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নেবার অবকাশ থাকলেও ইচ্ছা থাকে না সবার। আগ্রহও নেই বহুজনের। তাছাড়া চোখ থাকলেই দৃষ্টি শক্তি কি থাকে সবার? কান থাকলেই কি শুনতে পায় সবাই?

না। চোখ, কান থাকলেই দৃষ্টি শক্তি বা শ্রবণ শক্তি থাকে না। হৃদপিণ্ড তো সবারই আছে ; মন, সংবেদনশীল মন কি সবার হয়?

না।

শুধু দুমুঠো অন্নের জন্য যাঁরা ডালহৌসীর রণাঙ্গনে নিত্য সংগ্রামে মত্ত, তাঁদের কথা আলাদা। মার্চেন্ট অফিসের হৃদয়হীন ছোট কর্তাদের ভজনায় যাঁদের সারা জীবন কেটে যায়, তাঁরা আশপাশে দেখবেন কখন?

সবাই তো ওই দলের নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের অফুরন্ত অবকাশ রয়েছে সংসারের চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নেবার। কিন্তু অপরের মুখের হাসি, চোখের জল দেখার প্রয়োজন কি? আশপাশের মানুষগুলো বাঁচল কি মরল, হাসল কি কাঁদল, তাতে ওই সার্থক স্বার্থপরদের কি আসে যায়?

কিছু না। বিন্দু মাত্র না। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের খবর না নেওয়াই তো বড় হবার লক্ষণ!

অফিসারের দল বেয়ারা-চাপরাশী-কেরানীদের সেলাম নেন কিন্তু তাদের সঙ্গে নিবিড়

যোগাযোগ? নেভার? অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, প্রেস্টিজ সব গোল্লায় যাবে যে!

রাজভবনের বেয়ারা-চাপরাশীদের বেশি দূরে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। তবে খুব বেশি কাছে টানতেও অফিসারের দল নারাজ।

সেকেন্ড পাঞ্জাব ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের ব্যারাক থেকে ক্যাপ্টেন রায় যখন প্রথম রাজভবনে এলেন, তখন তিনিও শুধু সেলাম নিতেন। আমজাদ আলি, রমজান, হরকিষণ, মনোহরলালদের রোজ দেখতেন, সেবা নিজেন কিন্তু ঠিক চিনতে চাইতেন না। ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও ক্যাপ্টেন রায়ের দৃষ্টিটা উদাস হয়ে শূন্য আকাশের দিকে চলে যেত।

আমজাদ আলি, রমজানের দল এজন্য কিছু মনে করত না। ওইটাই তো নিয়ম।

ব্যাচিলার এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন রায়কে রাজভবনের সামনের ওই স্যান্ডস্টোনের স্পর্শ-ধন্য কোয়ার্টারে আশ্রয় নিতে হয়নি। ওই গুটিকতক কোয়ার্টার নিয়ে মারামারি যেসব সরকারি অফিসারের দল সরকারি পয়সায় বার কয়েক দার্জিলিং ঘুরে পাহাড়ের প্রেমে হাবুডুবু খান, ওই কোয়ার্টারগুলির প্রতি তাঁদের বড় মোহ, বড় আকর্ষণ। লাটসাহেবের ঘোড়ার আস্তাবল ও মোটরের গ্যারেজের পাশে বা উপরে থাকার ইজ্জত কি বাগবাজার বা ভবানীপুরে সম্ভব? লাটসাহেবের সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি ছাড়াও আরও দুজন একজন অফিসের আস্তাবল-গ্যারেজের পাশে অফিসার্স কোয়ার্টাসে আস্তানা পান। ভাগ্যক্রমে ম্যারেড এ-ডি-সি-ও পেতে পারেন ওর একটি সুইট।

অফিসারের দল সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের নিজের ফ্ল্যাটকে মিনিয়েচার রাজভবন করে রাখেন। ছমাস-এক বছর কাশ্মীরি কার্পেট প্রিন্স অফ্ ওয়েলস বা ডাফরিন সুইটে রাখার পর সেগুলো চলে যায় ওই আস্তাবলের পাশের অফিসারদের ফ্ল্যাটে। আরো অনেক কিছু চলে যায় ওইসব অফিসার্স ফ্ল্যাটে। থ্রোন রুমের চেয়ার, কাউন্সিল চেম্বারের পর্দা, লাটসাহেবের ড্রইংরুমের সোফা থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছু নজরে পড়বে ওইসব মিনিয়েচার রাজভবনগুলিতে।

বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না? রমজান বা আমজাদ আলিকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। ওরা তো সিনিয়ার কর্মচারী। নতুন ছোকরা বেয়ারা-চাপরাশীদের জিজ্ঞাসা করুন। ওরাই সব বলে দেবে। বলে দেবে যে কিছু কিছু অফিসারের বিছানার গদি, চাদর, বেডকভার, বাথরুমের তোয়ালে, গায়ে মাখা সাবান পর্যন্ত আসে ওই বড় রাজভবনের স্টোর থেকে।

রাজভবনের অধিকাংশ অফিসারই এইসব উপরি পাওনা নিয়েই মত্ত। রমজান বা আমজাদের সঙ্গে পুরনো দিনের গল্প করার মেজাজ বা প্রবৃত্তি কোথায়?

ক্যাপ্টেন রায় খাস রাজভবনের অন্দর-মহলে আস্তানা পেয়েছিলেন স্বয়ং হিজ একসেলেন্সির অর্ডারে। তাই রমজান বা আমজাদকে বেশি দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি।

প্রথম প্রথম ডিউটির পর চলে যেতেন অফিসারদের কোয়ার্টারে প্লেট ভর্তি কাজু আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় কফি খেতে খেতে আড্ডা দিতে বেশ লাগত। সকালে, দুপুরে কাজ না থাকলে চলে যেতেন এ-ডি-সি স্কোয়াড্রন লিডার নরেন্দ্রপ্রসাদ সিং-এর কোয়ার্টারে। বিকানীরের মরুভূমির লোক হলেও মনটা বড় সরল, সহৃদয়।

ক্যাপ্টেন রায়ের আজও মনে পড়ে সেদিনের কথা। এ-ডি-সি ইন ওয়েটিং ছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার সিং। তিনিই ক্যাপ্টেনকে নিয়ে গিয়েছিলেন গভর্নরের কাছে। তারপর পরিচয় করিয়েছিলেন অন্যান্য অফিসার ও কর্মীদের সঙ্গে। অতগুলো লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে করতেই অনেক বেলা হয়ে গেল।

রাজভবনের দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে স্কোয়াড্রন লিডার সিং একবার ঘড়িটা

দেখে বললেন, 'কাম অন, লেট আস্ রাস ফর লাঞ্চ।'

ক্যাপ্টেন রায় জানতে চইলেন, কোথায় খেতে যাবেন?

'কোথায় আবার? আমার কোয়ার্টারে।'

'আবার আমার জন্য...'

সিং মুখে কিছু জবাব দেয়নি, শুধু একটু হেসেছিল। প্রায় ডবল মার্চ করার মতো লম্বা পা ফেলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাজির হল কোয়ার্টারে।

পর্দা সরিয়ে সামনে ড্রইংরুমে ঢুকতেই যিনি অভ্যর্থনা করলেন, তিনি মিসেস পূর্ণিমা সিং।

'ক্যাপ্টেন মীট মাই ওয়াইফ পূর্ণিমা।' পূর্ণিমা সিং হাত জোড় করে একটা নমস্কারও করলেন না। 'আর মীট মাই ওয়াইফ করতে হবে না, চল খেতে চল।'

ক্যাপ্টেন রায় অতি পরিষ্কার স্পষ্ট বাংলা কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। এক ঝলক দুজনের দিকে তাকিয়ে মিসেস সিং-এর উদ্দেশ্যে বললেন, 'চমৎকার বাংলা শিখেছেন তো!'

পূর্ণিমা মুচকি হেসে পর্দা সরিয়ে ভিতরে চলে গেল!

স্কোয়াড্রন লিডার সিং একটু চাপা গলায় বললেন, 'ক্যাপ্টেন বিয়ের আগে সী ওয়াজ মিস পূর্ণিমা মুখার্জী।'

'আই সি!'

পূর্ণিমা বাঙালি হলেও যোধপুরের মেয়ে। জন্ম, মামাবাড়ি পাটনাতে হলেও যোধপুরে কাটিয়েছে শৈশব, কৈশোর, যৌবন। পূর্ণিমার বাবা যোধপুরের সর্বজনপ্রিয় বাঙালি ডাক্তার! সারাদিন ডাক্তারি করে সন্ধ্যার পর তাস-পাশা-চা-সিগারেট। রবিবারে তানপুরা, হারমোনিয়াম তবলা। নিজে গাইতেন 'আয়েনা বালম', স্ত্রী গাইতেন 'একটি নমস্কারে প্রভু', মেয়ে পূর্ণিমা গাইত 'তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।'

সন্ধ্যাবেলার সে আড্ডায় কে না থাকতেন? হিজ হাইনেসের প্রাইভেট সেক্রেটারি, ডেপুটি কমিশনারের স্ত্রী, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে যোধপুর এয়ারফোর্স স্টেশনের ছোট বড় অফিসারের দল। আসতেন ফ্লাইট লেফট্‌ন্যান্ট নরেন্দ্রপ্রসাদ সিং।

সে এক ইতিহাস! কলকাতার রাজভবনের অফিসার্স ফ্ল্যাটে এসেও পূর্ণিমা ভুলতে পারে না পুরনো দিনের সন্ধ্যাবেলার মজলিশ। কলকাতায় ঠিক আত্মীয়-বন্ধু কেউ নেই। আর রাজভবনের অফিসাররা সন্ধ্যাবেলায় তানপুরা হাতে নিয়ে বসবার কথা কল্পনাও করতে পারে না।

স্কোয়াড্রন লিডার সিং যখন বাংলাদেশের গভর্নরের এ-ডি-সি মনোনীত হলেন, তখন আনন্দে, খুশিতে ফেটে পড়েছিল পূর্ণিমা। 'এ তোমাদের বিকানীর বা চণ্ডীগড় নয়। দেখো কি মজা করেই দিন কাটবে।'

এখন সন্ধ্যা যেন কাটতে চায় না। কত সিনেমা-থিয়েটার দেখা যায়? তাছাড়া পূর্ণিমা তো বাইরের আনন্দের চাইতে ঘরের আনন্দই বেশি চায়। সিং-এর যেদিন ইভনিং ডিউটি থাকে, সেদিন পূর্ণিমা সীতার বনবাসের শূন্যতা অনুভব করে মনে মনে।

তাই তো ক্যাপ্টেন রায়কে বড় সমাদর করে গ্রহণ করলেন ওঁরা দুজনে।

স্কোয়াড্রন লিডার সিং খেতে বসে বললেন, 'প্লিজ ডোন্ট মিসটেক। পূর্ণিমা বাঙালি হলেও এ প্রোডাক্ট অফ আওয়ার রাজস্থান।'

'বাজে বকো না! তোমাদের দেশে ডাক্তার ছিল না বলেই তো আমার বাবাকে যেতে

হয়েছিল।'

এবার ক্যাপ্টেন রায়ের দিকে ফিরে পূর্ণিমা বলল, জানেন দাদা, আমার বাবাই যোধপুরের প্রথম অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার।'

স্কোয়াড্রন লিডার একটু সংশোধন করে দেন, 'না, না, একটু ভুল হয়ে গেল। শুধু যোধপুরের নয়, সারা রাজস্থানের মধ্যে উনিই প্রথম ডাক্তার।'

ওদের দুজনের মধ্যে এমনি টুকটাক ঠোকাঠুকি বেশ লাগত ক্যাপ্টেনের। বলত, 'আমাদের আর্মির ভাষায় তোমাদের এই বর্ডার স্কারমিশ বেশ এন্টারটেনিং।'

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই হাসত।

যাই হোক প্রথম কিছুকাল বেশ কেটেছে ওদের নিয়ে। সকালে ব্রেকফাস্টের জন্য আর যেতো না, তবে দুপুরে-রাত্রে খেতেই হতো।

ক্যাপ্টেন রায় বলেছিল, 'সিং, দিস কান্ট বি দি রেগুলার ফিচার। তোমাকে এর বিনিময়ে...'

স্কোয়াড্রন লিডার জিভ কেটে বলেছিল, 'মাই গড! আমি মাড়বারের লোক হতে পারি কিন্তু ঠিক এতটা ব্যবসাদার নই। তাছাড়া ডক্টর মুখার্জীর মেয়ে ঠিক দুজনের সংসার চালাতে শেখেনি।'

ওরা যতদিন ছিল রমজান বা আমজাদের সঙ্গে ঠিক মিশতে পারেননি ক্যাপ্টেন। প্রয়োজন হয়নি। তাগিদ বোধ করেননি ওদের কাছে টেনে নেবার। রমজানের কাছে অ্যান্ডারসন সাহেবের ছোকরীর কাহিনি শোনার চাইতে পূর্ণিমার সঙ্গে খোসগল্প করার টান ছিল অনেক বেশি।

'আচ্ছা দাদা, একদিন ডায়মন্ডহারবার বেড়াতে যাবেন?'

তুমি ডায়মন্ডহারবার যাওনি?'

চোখ দুটো ঈষৎ ঘুরিয়ে সিং-কে একটু আড় চোখে দেখে পূর্ণিমা বলে, ওই মরুভূমির লোকটার কোনো রসবোধ আছে?'

স্কোয়াড্রন লিডার সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনী কাটে, 'ইউ আর পারফেক্টলি জাস্টিফায়েড পূর্ণিমা! আমার রসজ্ঞান নেই বলেই 'আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা, প্রিয় আমার ওগো প্রিয়–' গান শুনে তোমার কাছে সারেন্ডার করেছিলাম।'

ক্যাপ্টেন রায় হাসতে হাসতে বলেন, 'সিং এয়ার ফোর্সে অফিসার হয়ে এসব সিক্রেট ডিস্ক্লোজ করা অন্যায়।'

স্কোয়াড্রন লিডার সিং হঠাৎ বদলি হয়ে চলে গেল আম্বালা। এতদিন পরে ক্যাপ্টেন রায় আবিষ্কার করলেন, এই পাথরে গাঁথা রাজভবনে মনের আনন্দ, প্রাণের রসের বড় অভাব। অনুভব করলেন তিনি বড় নিঃসঙ্গ।

চুপচাপ নিজের ঘরের মধ্যে শুয়েছিলেন তিনি। দরজাটায় নক্ করে আমজাদ এল ভিতরে। একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, 'ক্যাপ্টেন সাব, মন খারাপ করবেন না। যান একটু ঘুরে আসুন।'

মুখে কিছু বললেন না ক্যাপ্টেন রায়। তবে সেই প্রথম উপলব্ধি করলেন, যাদের এতদিন দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, যাদের দেখেও দেখেননি, যাদের মানুষ বলে স্বীকার করতে চাননি, তাদেরও প্রাণ আছে, আছে হৃদয়, আছে সহানুভূতি।

ডিউটির পর এখন আর চুপচাপ বসে থাকতে চান না ক্যাপ্টেন। ডেকে নেন রমজান, আমজাদ আলিকে। গল্প বলেন, গল্প শোনেন। শোনেন অ্যান্ডারসন সাহেবের মেয়েদের কীর্তি।

স্কোয়াড্রন লিডার সিং চলে যাবার পর আর কোনো অফিসারের সঙ্গে ক্যাপ্টেন রায় বিশেষ হৃদ্যতা গড়ে তুলতে চাননি। আশা করেছিলেন সেক্রেটারি বা ডেপুটি সেক্রেটারির সংসারে ছোট ভাইয়ের মর্যাদা পাবেন। ওদের সংসারের পাঁচ জনের একজন হয়ে কাটিয়ে দেবেন কলকাতায় কটা বছর। বাংলাদেশের বাঙালি তো মিশুক হয় বলেই ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছেন। কলকাতায় আত্মীয়স্বজন না থাকলেও বন্ধুহীন হয়ে নিশ্চয়ই কাটাতে হবে না।

এসব কথা মনে হলে ক্যাপ্টেন রায়ের হাসি পায়। তাইতো আমজাদ-রমজানের দল এগিয়ে আসতে তাদের ফিরিয়ে দেননি, নিজেও এগিয়ে গেছেন ওদের কাছে। ভালোই হয়েছে। রমজান-আমজাদের কাছে কত কি জানতে পেরেছেন, শিখতে পেরেছেন! এই রাজভবনে তো কোনো অফিসার নেই, যিনি অ্যান্ডারসন সাহেবের কাহিনি বলতে পারেন। কে জানে ওর মেয়েদের বেলেল্লাপনার কাহিনি?

দু-একজন বুড়ো কেরানি হয়তো জানে কিন্তু তারা কিছুতেই ইংরেজ লাটের নিন্দা করবে না। ইংরেজদের কাছে অহর্নিশি অপমান সহ্য করে চাকরি করতে হয়েছে এদের। তবু এরা আজ ইংরেজ বলতে বিভোর হয়।

আমজাদ বেশি কথা বলে না। তবুও সেই আমজাদের মুখেই ক্যাপ্টেন রায় শুনেছিলেন, 'আজকাল লম্বা-চওড়া কথা বলেন কিন্তু আমরা তো সরকার বাবুকে ইংরেজ আমলেও দেখেছি।'

'কেন ইংরেজ আমলে উনি কি করতেন?'

'শুনলে বিশ্বাস করবেন?'

'কেন করব না?'

'তবে শুনে রাখুন এইসব বাবুদের কীর্তি।'...

সারা বাংলাদেশের পি-ডবলিউ-ডি ডিপার্টমেন্টের যত ওভারশিয়ার ছিল, তাদের মধ্যে সব চাইতে ইংরেজভক্ত খুঁজে বার করতে চীফ ইঞ্জিনিয়ার মাস ছয়েক সময় নিলেন। সেকালে বাঙালি ছোকরাদের সরকার বাহাদুর বিশ্বাস করতেন না বলেই এই সামান্য কাজের ভার স্বয়ং চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে দেওয়া হয়েছিল। চীফ ইঞ্জিনিয়ার নিজেই সিলেক্ট করতে পারতেন তবে কে কোথা থেকে কি করে বসে—এই ভয়ে দুজনের নাম সুপারিশ করে পাঠিয়েছিলেন ডেপুটি মিলিটারি সেক্রেটারির কাছে।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শেষ পর্যন্ত রাজভক্তির সিংহদ্বার পার হলেন শ্রীনিশিকান্ত সরকার। আমাদের সরকার মশাই।

'জানেন এ-ডি-সি সাব, সরকারবাবুর কি কাজ ছিল?'

'পি-ডবলিউ-ডি-র ওভারশিয়ার যখন, তখন নিশ্চয়ই বিল্‌ডিং-এর...

আমজাদ মাঝ পথেই আটকে দেয়, 'তাহলে আর কি দুঃখ ছিল। সরকারবাবু শুধু বাথরুম দেখাশুনা করতেন।'

'স্যানিটারি ফিটিংস দেখাশুনা করতেন।'

'আমরা ওকে বলতাম বাথরুম বাবু। আর মিলিটারি সেক্রেটারি অফিসের বাবুরা ওকে বলতেন টাট্টি বাবু!'

আমজাদ একটু হাসে! 'শুধু বাথরুম দেখাশুনা করে ওর ইংরেজ ভক্তি আরো বেড়ে গেল। উনি বলতেন, সাহেবরা জানে কি ভাবে বাথরুম ইয়ুজ করতে হয়। যদি কখনও কোনো ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট হাউসে এসে দু-একদিন থেকে গেলেন, তাহলে আর কথা নেই! উনি চলে যাবার পর শুরু হতো সরকারবাবুর বকবকানি, ইন্ডিয়ানরা বাথটব ইয়ুজ করতে জানে না অথচ

করবেই।'...

'সরকারবাবুর 'বস' ছিলেন ডেপুটি মিলিটারি সেক্রেটারি। একটা ছোকরা মেজর। ছোকরাটা ইন্ডিয়ানদের রাস্তার কুকুরের মতো মনে করত। কথায় কথায় স্কাউন্ড্রেল বিচ, ব্লাডি, বাগারের মতো সাধারণ বিশেষণে উনি খুশি হতে পারতেন না। আর তার সঙ্গে বুটের ছোট্ট লাথি। কোনো কর্মচারী একবার 'এক্সকিউজ মি' স্যার, বললেই হল! সঙ্গে সঙ্গে ছোকরা মেজর বুটের এক লাথি দিয়ে বলত, 'তোর মাথায় কি ঘিলু নেই? তুই কি কুকুরের পেটে জন্মেছিস?'

'কেউ সহ্য করতে পারত না ওই ছোকরাটাকে। ধরাধরি করে অন্য সবাই বদলি হয়েছিল অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে। শুধু সরকারবাবু কোনোদিন প্রতিবাদ করেননি, কোনোদিন বদলি হতে চাননি। 'আরে বাপু, ওসব কি গায়ে মাখলে চলে? কাজ শিখতে হলে এইসব কড়া সাহেবদের কাছে শেখা যায়।'

আমজাদ বলল, 'এই ছোকরাটা ব্রেবোর্ন সাহেবের সময়েই গভর্নমেন্ট হাউসে এল। পরে শুনেছিলাম ও ব্যাটা মেদিনীপুরে অনেক অত্যাচার করেছিল, অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছিল। তাই প্রমোশন দিয়ে ওকে গভর্নমেন্ট হাউসে আনা হয়।'

সেই সরকারবাবু আজ রাজভবনের মস্ত অফিসার!

একদিন সুবিধে মতন ক্যাপ্টেন রায় পাকড়াও করলেন, 'সরকারবাবু অনেকদিন কাটালেন এই গভর্নমেন্ট হাউসে তাই না।'

একটু গাম্ভীর্য এনে উনি বললেন, 'হ্যাঁ, তা হল অনেক দিন।'

'আপনি তো পুরনো জমানাও দেখেছেন।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল সরকারবাবুর। দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে দেখে নিলেন পুরনো লাট সাহেবের দুটো একটা পেন্টিং। 'ক্যাপ্টেন, দ্যাট ওয়াজ গুপ্ত পিরিয়ড অফ মাই লাইফ।'

'তা তো বটেই!'

শেরওয়ানির পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে মাথার গান্ধী ক্যাপটা ঠিক করে নিলেন সরকারবাবু।

'...কি বলব সে-সব দিনের কথা! তখন সবকিছুরই একটা স্ট্যান্ডার্ড ছিল। আর আজকাল? হা, ভগবান! এই গভর্নমেন্ট হাউস! আমরা কি এসব প্যালেসে থাকার উপযুক্ত? এখন গভর্নমেন্ট হাউসের লনে আলু-পটলের চাষ হয়, মার্বল হলে খোল-করতাল বাজিয়ে কেত্তন হয়! আরে বাপু, আলু-পটলের চাষ করতে হয় তো দত্তপুকুর-গোবরডাঙা যাও, কেত্তন শুনতে হয় তো নবদ্বীপ যাও, এই গভর্নমেন্ট হাউসে কেন?'

এতক্ষণ প্রায় স্বগতোক্তি করছিলেন সরকারবাবু। এবার ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বললেন, 'আজকাল লাটসাহেবকে ডেপুটি সেক্রেটারির সঙ্গেও হাসি-ঠাট্টা করতে দেখা যাবে। আর আগে? লাটসাহেবকে দেখলে ডেপুটি সেক্রেটারির আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যেত। অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন কি এমনি গোল্লায় যেতে বসেছে?'

এ-ডি-সি সাহেব ছোট্ট সায় দেন, 'তা যা বলেছেন আপনি!'

'আপনি তো সেদিন এলেন। কি আর বলব আপনাকে। এমন লাটসাহেবও দেখলাম যিনি সেক্সন অফিসারকে হিসেব নিকেশ পাল্টাতে বলেন।'

'কেন?'

'কেন আবার? নিজের সুনাম রাখার আগ্রহে।'

কথাগুলো যে একেবারে মিথ্যে, তা নয়। দেশে যখন খাদ্য সমস্যা চরমে উঠল, যখন দেশের

লিডাররা বন্দেমাতরম ভুলে 'গ্রো মোর ফুড' শ্লোগান দিতে শুরু করলেন, তখন লাটসাহেব ঠিক করলেন, রাজভবনেও চাষ করতে হবে। সরকারি ফার্ম থেকে সব চাইতে ভালো বীজ আনানো হল, বিখ্যাত কেমিক্যাল কোম্পানি থেকে ফার্টিলাইজার আনা হল। জাপানীজ এম্বাসেডরের উপহার দেওয়া ছোট্ট হ্যান্ড ট্রাক্টর চালিয়ে ধান চাষের উদ্বোধন করলেন স্বয়ং লাটসাহেব। তারপর ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার, ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ সীডস্, ডেভলপমেন্ট অফিসার, ফার্টিলাইজার কোম্পানি রোজ কয়েক ঘণ্টা কাটাতেন রাজভবনে ওই ছোট্ট জমির তদারকিতে। কয়েকমাস অজস্র অর্থ ব্যয়ে একদিন সত্যি সত্যি ধানের শিষ বেরুল। পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরাম্যান তলব করে ডজন ডজন ছবি নেওয়া হল। এমনি করে একদিন বাইশ হাজার টাকার বিনিময়ে দুমণ ধান হল রাজভবনের উর্বর জমিতে।

হর্টিকালচারাল ডিপার্টমেন্টের শঙ্করলাল বলে, অত কাণ্ড করেও শেষ পর্যন্ত এক মণ ধানও হয়নি। ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার নিজের প্রেস্টিজ বাঁচাবার জন্য একদিন গাড়ি করে এক বস্তা ধান এনে মিশিয়ে দিলেন এই ধানের সঙ্গে।

সরকারবাবু পরে বলেছিলেন, 'স্বয়ং লাটসাহেবের নির্দেশে গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেনের খরচা কম দেখান হল। লড ব্রেবোর্ন বা স্যার জন হার্বার্ট হলে গভর্নমেন্ট হাউসে চাষ করতে দিতেন না আর চাষ করলেও খরচ দেখবার জন্য সেক্সন অফিসারকে অনুরোধ করতেন না।

কথাটা যে বেঠিক, তা নয়। লর্ড ব্রেবোর্ন বা স্যার জন হার্বার্ট হয়তো অনেক কিছুই করতেন না, হয়তো তাঁরা মহানুভব ছিলেন, কিন্তু ডেপুটি মিলিটারি—ওই ছোকরা মেজরটা যে কুট্টাকা বাচ্চা না বলে সরকারবাবুকে আদর করতে পারতেন না? তবুও সেটাই ছিল ওর জীবনের গুড পিরিয়ড, স্বর্ণ যুগ!

চমৎকার! এই লোকগুলোকে দেখলেও ক্যাপ্টেন রায়ের ঘেন্না করে। তাইতো আমজাদ-রমজানকে অনেক বেশি ভালো লাগে তাঁর।

আমি লাইফে নিঃসঙ্গতার কোনো প্রশ্নই নেই। সারাদিন শুধু কাজ আর কাজ। বিকেল বেলা মেসে ফিরেই ক্লান্ত দেহটা লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। রুম বয় অনুগ্রহ করে যেদিন চা নিয়ে আসতে দেরি করত সেদিন ভাগ্যক্রমে কিছুক্ষণ ঘুমিয়েও নিতেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? বিশ পঁচিশ মিনিট। না হয় আধঘণ্টাই হবে। কোনো কোনো দিন রুম বয় চা নিয়ে আসতে দেরি করলেও ঘুমুতে পারতেন না পাশের ঘরের শ্রীবাস্তবের জন্য। ক্যাপ্টেন এল. পি. শ্রীবাস্তব। এলাহাবাদের ছেলে না হলেও ইউ পি-র তো বটে। তাই ক্যাপ্টেন রায়ের সঙ্গে একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা। অফিস থেকে ফিরে চিঠিপত্র পড়ার পর রোজ আসে ক্যাপ্টেন রায়ের ঘরে।

রোজ?

হ্যাঁ। মন ডে টু স্যাটার ডে। যে কদিন পোস্টাফিস খোলা থাকে আর কি! প্রত্যেক দিন বেরিলী থেকে যমুনা ত্রিবেদীর একটা চিঠি আসবেই। সে চিঠি আর কাউকে দেখাবে না। শুধু ক্যাপ্টেন রায়কে পড়াবে। না পড়িয়ে থাকতে পারে না। কেউই পারে না। ক্যাপ্টেন শ্রীবাস্তবও পারে না।

রাতের অন্ধকারে ফুল ফোটে। ভোরের আলোয় সে আত্মপ্রকাশ করে সবার কাছে। কিন্তু অমানিশার অন্ধকারেও কি সে সত্যি লুকিয়ে থাকতে পারে? অজ্ঞাত রাখতে পারে কি নিজের পরিচয়? না। চোখের আলোয় তাকে দেখা না গেলেও গন্ধ ছড়িয়ে সবাইকে জানিয়ে দেয় তার পূর্ণ যৌবনের খবর। শুধু ক্যাপ্টেন শ্রীবাস্তব নয়, দুনিয়ার সবাই লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করে। বেরিলী-কাঠগুদামের পথে জীপ অ্যাক্সিডেন্টে বেশ আঘাত পাবার পর ডাঃ ত্রিবেদীর আস্তানায় ওকে কটি দিন কাটাতে হয় সেকথা হয়তো ওদের রেজিমেন্টের প্রায় সবাই জানে। কিন্তু ওরা কেউ জানে না ওই আঘাতের যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই কাছে পেয়েছিল ডাঃ ত্রিবেদীর মেয়েকে-অধ্যাপিকা যমুনা ত্রিবেদীকে। ক্যাপ্টেন রায় ছাড়া আর কেউ জানে না ওদের কথা। অনেক কথা। অনেক কাহিনি।

যমুনা রোজ একটা চিঠি লেখে এল পি-কে। সে চিঠি নিয়ে এল পি ছুটে আসে ক্যাপ্টেন রায়ের ঘরে। বার বার পড়বে সে চিঠি। তারপর জানতে চাইবে তার অর্থ, মর্মার্থ, গূঢ় অর্থ।

'রয়, হোয়াট ইজ ইওর রিঅ্যাকসান?'

'ক্যাপ্টেন রায় হাসতে হাসতে বলে, 'প্রেমে করবে তুমি আর রিঅ্যাকসান হবে আমার?'

'না, মানে চিঠি পড়ে তোমার কি মনে হয়? এই চিঠিটার টোন্‌টা একটু আলাদা না?'

'যমুনায় ডুব দিয়েছ তুমি আর চিঠির টোন্ বুঝব আমি? তাই কি হয়?'

এল পি যুক্তিতর্ক বোঝে না বুঝতে চায় না। প্রেমে পড়লে যেমন অন্যে বোঝে না। ক্যাপ্টেন রায় তা উপলব্ধি করে। কিন্তু তবুও বেশ কেটে যায় বিকেল বেলার কিছু সময়।

সন্ধ্যার পর বিগ্রেড হেড কোয়ার্টাসে মেসে কিভাবে যে সময় কাটে তা কেউ খেয়াল করে না। নাচ-গান, খেলাধুলো, ড্রিঙ্ক ডিনারের শেষে যখন হুঁশ হয়, তখন আর কতটুকুই বা রাত বাকি থাকে?

আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে এলেও আমি লাইফে কেউ নিঃসঙ্গতা অনুভব করে না, করতে পারে না।

কলকাতার রাজভবনে কয়েক শ মানুষ কাজ করেন। দিবারাত্র এক গণ্ডীবদ্ধ রাজভবনে এঁরা থাকেন কিন্তু নৈকট্য নেই নিজেদের মধ্যে। প্রাণহীন ফর্মালিটি আছে, নেই ভালোবাসার উষ্ণতা, উত্তাপ, আনন্দ। স্কোয়াড্রন লিডার সিং চলে যাবার পর যখন এই নির্মম সত্য ক্যাপ্টেন রায় আবিষ্কার করলেন, তখন বড় আঘাত পেয়েছিলেন মনে মনে, আহত হয়েছিল অনেক দিনের প্রত্যাশা, ভেঙেছিল অতীত দিনের স্বপ্ন।

আজ আর সে দুঃখ নেই। রমজানের কাছে অ্যান্ডারসেন সাহেবের মেয়েদের কীর্তি শুনতে বেশ লাগে ব্যাচিলার এ-ডি-সি সাহেবের।

আরে সাব, কি বলব আপনাকে? লেড়কি দুটো কি কাণ্ডই না করত! আমার যেমন সরম লাগত তেমনি ডর লাগত...'

'কেন? তোমার ভয় লাগার বা লজ্জা পাবার কি ছিল?'

বুড়ো রমজান একটু না হেসে পারে না। হাসবে না? এখন না হয় ও বুড়ো হয়েছে, অ্যান্ডারসন সাহেবের আমলে তো জোয়ান ছিল। সেই বয়সে ওই জোয়ান লেড়কিদের খিদমদ্গারী করতে লজ্জা হবার কথা বৈকি!

বেঙ্গল ক্লাবে জেফারসন সাহেবের আতিথ্য উপভোগ করার জন্য অ্যান্ডারসন তনয়াদের আবির্ভাব হতো সন্ধ্যার পরই। রমজান অস্টিনের দরজা খুলে দিতেই স্বয়ং জেফারসন সাহেব অভ্যর্থনা করতেন মিস ডায়না অ্যান্ডারসন ও মিস ডরোথি অ্যান্ডারসনকে। হাজার হোক

লাটসাহেবের মেয়ে! সম্মান দেখাতে কার্পণ্য করতেন না ছোকরা জেফারসন সাহেব। টপ-হ্যাট খুলে মাথা নিচু করে বিনম্র কণ্ঠে বলতেন, 'গুড ইভনিং!'

'গুড ইভনিং!'

তারপর ডান হাত এগিয়ে দিয়ে আলতো করে তুলে নিতেন ওদের ডান হাত, স্পর্শ করাতেন নিজের ওষ্ঠে। যেন রয়্যাল ফ্যামিলির কাউকে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে।

বেঙ্গল ক্লাবের আত্মসচেতন অন্যান্য ইংরেজ বাসিন্দারা ভিড় না করলেও বেয়ারা-চাপরাশীরা ভীড় করত চারপাশে লাটসাহেবের মেয়েদের সেলাম দেবার জন্য। গর্বে অহঙ্কারে ওদের সামনে বুক ফুলিয়ে জেফারসন সাহেব ও অ্যান্ডারসন কন্যাদ্বয়কে অনুসরণ করত রমজান।

থার্ড ফ্লোর। রুম নম্বর থ্রি ফোর ফাইভ!

সাধারণত জেফারসন সাহেবের দু-একজন বন্ধুবান্ধব রোজই থাকতেন ওই সন্ধ্যাকালীন আসরে। রুম নম্বর থ্রি-ফোর ফাইভের প্রবেশ পথে তাঁরা অভ্যর্থনা জানাতেন ডায়না ও ডরোথিকে।

রমজান একটা চেয়ার নিয়ে দোরগড়ায় বসে থাকত। পাহারা দিত। বেঙ্গল ক্লাবের বেয়ারারা ট্রেতে ভর্তি করে যখন ড্রিংক নিয়ে যেত তখন রমজান একবার সেসব নেড়ে চেড়ে দেখত। একটু মেজাজের সঙ্গে জানতে চাইত, 'সব ঠিক হ্যায় তো?'

'জি হ্যাঁ।'

'যাইয়ে অন্দর।'

প্রথম দু-এক ঘণ্টা রমজানের কানে শুধু একটু আধটু হাসির আওয়াজ ভেসে আসত। ঘড়ির কাঁটা আরও খানিকটা ঘোরার পরে সে হাসি আরো-প্রাণবন্ত হতো, আরো বিচিত্র হতো। শুরু হতো নাচ-গান।

তখনকার দিনকালই আলাদা ছিল। ইংরেজ সাহেবসুবরা দিনের বেলা ক্লাইভ স্ট্রিট ডালহৌসী চৌরঙ্গীতে বেনিয়া বৃত্তি করত। কোটি কোটি টাকা লুঠপাট করে দেশে পাচার করত। সাধারণ ও স্বাভাবিক মানুষ চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাপির মতো লুঠপাঠ করতেও পারে না। ওটা অসাধারণ, অস্বাভাবিক, মত্ত প্রমত্ত কাজ। তাইতো চোর ডাকাতের দল কাজের পর মদের ভাটিতে বসে, যত্রতত্র রাত্রিবাস করে।

ইংরেজ বেনিয়ারা হাজার হোক কালচার্ড। তাইতো মদের ভাটিতে বসে মাটির ভাঁড়ে বা ভাঙা গেলাসে ওদের তৃপ্তি হয় না, হতো না। ওরা ক্লাব গড়ে, 'বার' খোলে। বেয়ারা-চাপরাশী নিয়োগ করে। শেয়াল কুকুরের মতো পশু প্রবৃত্তিতে ভরা। তবুও যত্রতত্র রাত্রিবাস? নৈব নৈব চ! ওরা ককটেল, ডিনার, ডান্সে মেয়েদের নেমন্তন্ন করে আপ্যায়ন করে, তিলে তিলে মত্ত প্রমত্ত করে। ধীরে ধীরে জাগিয়ে তোলে সুপ্ত প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয় চেতনা।

তারপর দপ্ করে জ্বলে উঠত আগুন।

সেকালের বেঙ্গল ক্লাব ছিল এদেরই তীর্থক্ষেত্র। জেফারসন ভাগ্যবান বলে ইন্দ্রিয় তুষ্টির জন্য পেয়েছিল অ্যান্ডারসন নন্দিনীদের। জনসন, জ্যাকসন জেন্ডারসনের অদৃষ্টে জুটত ভঙ্গ কুলীনরা।

রুম নম্বর থ্রি-ফোর ফাইভের দোরগোড়ায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের মতো পাহারা দিতে দিতে রমজান কি না দেখত? প্রথম প্রথম সব কিছু ঠিক বুঝতে পারত না। কিন্তু কিছু দিন পর সব কিছুই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার লাগত।

বেয়ারা আবার এক বোতল হুইস্কী ও তিন-চার বোতল সোডা নিয়ে হাজির হল। রমজান ভ্রু কুঁচকে পরীক্ষা করে দেখল বোতলগুলো। হুকুম করল, 'যাও।' পর মুহূর্তে আবার অর্ডার করল 'জলদি বাহার আনা!'

হাজার হোক গভর্নমেন্ট হাউসের বেয়ারা! অভিজাত বেঙ্গল ক্লাবের বেয়ারারাও সমঝে চলত। 'জি হুজুর'।

হুইস্কি সোডার খালি বোতলগুলো বেয়ারা নিয়ে বেরিয়ে যেতেই দরজাটা একটু ফাঁক করে রমজান ভিতরে উঁকি দেয়। না, বেশ জমেছে। ডায়না ডরোথিকে নিয়ে স্লো স্টেপে ডান্স হচ্ছে। এইটুকু সময়ের মধ্যে পাঁচজনে দুবোতল হুইস্কি ওড়ালে কুইক স্টেপে ড্যান্স করা যায়? তাহলে বেশ নেশা ধরেছে।

হাজার হোক ছোকরা বয়স! একটু দেখতে গিয়ে হয়তো রমজান সময়ের হিসেব রাখতে পারত না।

আবার ফিরে আসত দোরগোড়ার চেয়ারে। দেখত এপাশ-ওপাশ। দেখত কতজনের আসা-যাওয়া। হঠাৎ যেন চমকে উঠল। কে যেন আসছে এদিকে? যেন চিনি চিনি মনে হয়! রমজান তখনও ভাবছে। ভদ্রমহিলা সোজা চলে গেলেন উইলসন সাহেবের ঘরে। শাড়ি পরে উইলসন সাহেবের ঘরে?

ক্যাপ্টেন রায় প্রশ্ন করেন, 'বাঙালি মেয়ে?'

'অর কেয়া? তখন ঠিক বুঝতে পারিনি, পরে চিনেছিলাম। আগর নাম বলব তো আপনিও চিনবেন...'

'আমিও চিনব?' অবাক হয়ে জানতে চান এ-ডি-সি।

'বহুত আচ্ছি তরাসে চিনবেন। হরদম গভর্নমেন্ট হাউসে আসা-যাওয়া করছেন। মিটিং-এ লেকচার দিচ্ছেন, আখবারে ফটো ছাপা হচ্ছে...'

ক্যাপ্টেন রায় আর এগুতে চান না। হাজার হোক রমজানের সঙ্গে ঠিক এসব বিষয়ে আলোচনা করা তাঁর শোভা পায় না। মার্বেল পাথরে মোড়া রাজভবনের সর্বত্র যেন মৃত্যুর মতো শান্ত শীতল পরিবেশ। প্রাণ-চঞ্চল ক্যাপ্টেন রায় ঠিক সহ্য করতে পারেন না। অপারেশন্যাল এরিয়ায় নিঃসঙ্গতার বেদনা অনুভব করেছেন কিন্তু এমন অসহ্য মনে হয়নি। রাজপুতানার মরু প্রান্তরে ছোট তাঁবুতে থাকবার সান্ত্বনা ছিল যে সেখানে কেউ নেই, কিছু নেই। কলকাতার রাজভবনে তো কত মানুষের ভিড়, কত কি রয়েছে! অজ্ঞাত রহস্যে ভরা রাজভবনের প্রতি অসংখ্য মানুষের কত আকর্ষণ! কিন্তু ক্যাপ্টেন রায় প্রাণের স্পর্শ, ভালোবাসার উত্তাপ বিশেষ অনুভব করেন না বলেই রমজানদের একটু কাছে টেনে নেন।

তাছাড়া হাই-সোসাইটির নোংরামি রমজানের কাছে শোনার কি দরকার? সে নিজেই কি কম জানে? দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, জয়পুরে থাকার সময় কি কম দেখেছে? আর্মি ক্যান্টিন থেকে সস্তায় হুইস্কি পাবার জন্য কত মানুষের হ্যাংলামি দেখেছে সে! বিনা পয়সায় মদ খাবার জন্য আর্মি অফিসারদের সঙ্গে কতজন বন্ধুত্ব করে!

'ওসব বাদ দাও রমজান। তুমি অ্যান্ডারসন সাহেবের মেয়েদের কথা বল।'

রমজান কথার মোড় ঘুরিয়ে আবার শুরু করে ডায়না-ডরোথির কাহিনি।

রাত একটু গভীর হলে জেফারসন সাহেবের বন্ধুরা একে একে বিদায় নিতেন। রমজান ওদের সেলাম জানাত। দু-পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে একবার ধীর পদক্ষেপে জেফারসন সাহেবের ঘরে ঢুকত।

ঘর?

রমজান ভিতরে ঢুকে যা দেখত তাকে হারেম বলাই ঠিক। চোখে যা দেখত, তা এ-ডি-সি সাহেবকে বলা যায় না। ডায়না জেফারসন সাহেবের কোলের ওপর লুটিয়ে থাকত আর ডরোথি আপনমনে ড্রিংক করে যেত।

রমজান অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে সেলাম করে ঘড়ি দেখিয়ে বলত, 'নাইট ইলেভেন। কাম গভর্নমেন্ট হাউস।'

জেফারসন চিৎকার করে বলতেন, 'গেট আউট ব্লাডি বাগার।'

ডরোথি বলত, 'ব্লাডি জেফারসন ডোন্ট সাউট। গিভ হিম ড্রিঙ্কস্।'

রমজান আর এক মুহূর্ত দেরি করত না। ভয়ে চটপট পালিয়ে যেত ঘর থেকে।

এবার রমজান টেলিফোন করত গভর্নমেন্ট হাউসের পুলিশ অফিসে। 'হিজ এক্সেলেন্সীর মেয়েরা এখন যাবেন না। এখনও ওরা ঘরের মধ্যেই আছেন।'

রাত এগারোটার পর আধ ঘণ্টা অন্তর রমজানকে খবর দিতে হতো গভর্নমেন্ট হাউসে। প্রয়োজনবোধে পুলিশ অফিস সতর্কতা অবলম্বন করত। হাজার হোক অ্যান্ডারসন সাহেবের মেয়ে তো। বাপের পাপে মেয়েদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কিনা কে বলতে পারত?

বারোটা নাগাদ রমজান আর একবার ভিতরে গেল। একি ড্রইংরুমে ডরোথি একলা বসে মদ খাচ্ছে? ওরা দুজনে গেল কোথায়? প্রথমদিন রমজান সত্যিই ঘাবড়ে গিয়েছিল কিন্তু পরে জেনেছিল ডরোথির একটু বেশি নেশা হলেই জেফারসন আর ডায়না বেডরুমে চলে যেত।

'জানেন সাব, ছোট লেড়কিটা বড় বেশি সরাব খেতো কিন্তু বদমাস ছিল না। বড়া লেড়কী? হা আল্লা! এমন বদমাস লেড়কী আমি সারা জিন্দেগীতে আর দেখব না।'

রাত একটা-দেড়টা দুটোর সময় ওদের দুজনকে নিয়ে রমজান গভর্নমেন্ট হাউসে ফিরত। বেঙ্গল ক্লাব থেকে রওনা হবার আগে গভর্নমেন্ট হাউস পুলিশ অফিসে ফোন করে জেনে নিত কোনো গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকবে। এক একদিন এক একটা গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকত। ডায়না গাড়ি থেকে নেমে ঠিক টুক টুক করে হেঁটে লিফট্ এ চড়ত কিন্তু ডরোথির দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকত না প্রায়ই। কতদিন ডরোথিকে কোলে করে ঘরে পৌছে দিয়েছে রমজান। জোয়ান বয়সে সরাব খাওয়া বেহুঁশ জোয়ান লেড়কীকে কোলে নিতে গিয়ে রমজানের রক্ত হয়তো একটু দ্রুত চলাচল করত কিন্তু তাই বলে বেইমানী? কখনও করেনি।

বাংলাদেশের চারপাশে যত বেশি বোমা-পটকা ফুটতে লাগল অ্যান্ডারসন সাহেব তত বেশি ক্ষেপে উঠলেন। কনভোকেশন অ্যাড্রেস দেবার সময় অ্যান্ডারসন সাহেবের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ বাংলা গর্জে উঠল তরুণী কিশোরীর হাতের রিভলভারের মধ্যে। আহত ব্যাঘ্রের মতো অ্যান্ডারসন সাহেবও প্রতিহিংসার নেশায় জ্বলে উঠলেন। বাংলাদেশ আর বাঙালিকে শায়েস্তা করার নেশায় চব্বিশ ঘণ্টা বিভোর হয়ে থাকতেন স্যার জন অ্যান্ডারসন।

ডায়না-ডরোথি আরো বেশি দূর সরে গেল। আরো বেশি স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ পেল।

গভর্নরের লঞ্চে গঙ্গার মোহনা দেখতে যাবার সময় মিলিটারি সেক্রেটারি স্পেশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাপ্টেন লংম্যানের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা হল ডায়নার। তারপর থেকে সময়ে অসময়ে ডায়না যাতায়াত শুরু করল লংম্যানের কোয়ার্টারে। গভর্নমেন্ট হাউসের সামনেই লংম্যানের কোয়ার্টার। কর্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তা কমলেও ঠিক মেনে নিতে পারলেন না। ডরোথিকে নিয়ে একটু বেশি মাতামাতি শুরু করলেন।

'ঠিক এই টাইমে হামার ডিউটি বদলে গেল। আমি লাটসাহাবের পার্সোন্যাল ডিউটি দিতে শুরু করলাম। লেড়কিদের ঠিক খবর রাখতে পারতাম না। তবে ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে জেফারসন সাহেবের লড়াই বেশ জমে উঠেছিল। গভর্নমেন্ট হাউসের সবাইকে জব্দ করবার জন্য জেফারসন সাহেব তো একবার ডরোথিকে নিয়ে কোথায় চলে গেলেন দো-তিন হপ্তার জন্য...'

'আচ্ছা?'

'আর কিয়া? শেষে লংম্যান সাহেবকে জব্দ করার জন্য জেফারসন সাহেব ওরই সরকারি কোয়ার্টারে রিভলভারের গুলিতে সুইসাইড করেন।

'বল কি রমজান?'

'হ্যাঁ সাব। জেফারসন দেখাতে চেয়েছিলেন লংম্যান ওকে মার্ডার করেছে...'

রমজানের কাছে শুধু ডায়না-ডরোথির বেলেল্লাপনার কাহিনির মধ্যে ডুবে থাকতে পারেন না ক্যাপ্টেন রায়। আমজাদের দেওয়া ব্রেকফাস্ট খেয়ে সকাল বেলায় লাটসাহেবের সেবা করতে গিয়ে যে-সব দর্শনার্থীর সঙ্গে পরিচয় হয়, তাতে মন ভরলেও খেয়াল চরিতার্থ করা যায় না। তার জন্য চাই ইভনিং ডিউটি বা ট্যুর। সব ট্যুর, সব ইভনিংই রঙিন হয় না কিন্তু ঘুরে ফিরে রংমশালের রঙিন আলো নজরে পড়বেই।

স্কোয়াড্রন লিডার সিং এয়ারফোর্সে ফিরে গেছে অথচ পরবর্তী নেভাল এ-ডি-সি তখনও এসে পৌঁছাননি। কয়েক মাসের জন্য একজন আই-পি-এস পুলিশ অফিসার এ-ডি-সি-র কাজ করছিলেন। লাটসাহেবের ও রাজভবনের কতকগুলো আদব-কায়দা-নিয়ম-কানুন ও বৈশিষ্ট্য আছে। অনেক নিয়ম-কানুন আদব-কায়দার কথাই ফাইলে লেখা থাকে না। অনেকটা বিয়েবাড়ির স্ত্রী-আচারের মতো আর কি! বিয়ের মন্ত্র পাঁজি-পুঁথিতে পাওয়া যায় কিন্তু স্ত্রী আচার কোথাও লিখিত পাওয়া যায় না। দেখে শুনেই ওসব শিখতে হয়। লাটসাহেব ও রাজভবনের ক্ষেত্রে পাঁজি-পুঁথির মন্ত্রের চাইতে স্ত্রী আচারের প্রাধান্য ও গুরুত্বই বেশি। নতুন কোনো এ-ডি-সি-র পক্ষে এসব রপ্ত করা সহজ নয়।

টুকটাক সভা-সমিতিতে রাজ্যপালের অনুগমন করা বা ক্যাজুয়াল ভিজিটার্সদের রাজ্যপালের ড্রইংরুমে পৌঁছে দেবার কাজ নতুন এ-ডি-সি করলেও সব গুরুত্বপূর্ণ কাজই ক্যাপ্টেন রায়কে করতে হতো।

কাজের কি শেষ আছে এ-ডি-সি-র? কি না করতে হয় তাঁকে? লাভ-ম্যারেজের পর একলা স্বামীর ঘর করতে গিয়ে মেয়েদের যে অবস্থা হয়, এ-ডি-সিদেরও অনেকটা সেরকম। কলেজ-ইউনিভার্সিটি, কফি-হাউস-সিনেমাহল, লেক-ডায়মন্ডহারবার-দীঘার পর ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সিংহদ্বার টপকে স্বপনচারিণীকে সংসার জীবনে প্রবেশ করতে হয়। চাল-ডাল-আটা-ময়দা হাঁড়ি-কড়া-হাতা-খুন্তীর তদারকি করতে হয়, ইন্টিরিয়র ডেকরেটর হয়ে ওল্ড ওয়াইন ইন নিউ বটল-এ চালাতে হয়, সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে স্বামীকে গান শোনাতে হয় অথবা ট্যাক্সিতে যাবার সময় স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে ন্যাকামির অভিনয় করতে হয়। আরো

কত কি করতে হয়। মান-অভিমান রাগ-অনুরাগের দোলনায় দোল খেতে খেতে নার্সিংহোম ঘুরে আসার পরও স্বামীকে খুশি করার জন্য অভিসারিকা সাজতে হয়।

একটা স্বামীকে তাল দিতেই স্বপনচারিণীর প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। আর-এ-ডি-সি-কে? নিত্য নতুন স্বামীর মনোরঞ্জন করতে হয় তাঁকে। রাজভবনে নিত্য অতিথিদের আগমন। অতিথি সৎকারের দায়িত্ব গভর্নরের ডেপুটি সেক্রেটারির কিন্তু তাঁদের অভ্যর্থনার দায়িত্ব এ-ডি-সি-র নয়। কলকাতার বাইরে লাটসাহেবের ট্যুর ডিউটিতে থাকলে তো কথাই নেই। বেয়ারা, চাপরাশি, অর্ডালী থাকলেও সব দায়িত্বই এ-ডি-সি-র। লাটসাহেবের পোশাক-আসাক খাওয়া-দাওয়া ওষুধ-পত্র ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছুই এ-ডি-সি-কে দেখতে হয়। এইখানেই শেষ নয়।

এক একজন লাটসাহেবের এক একরকম বাতিক থাকে। যে লাটসাহেব নরম বালিশে শুতে পারেন না, তাঁর ট্যুর প্রোগ্রাম ঠিক হবার পরই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে এ-ডি-সি-র টেলিগ্রাম পাঠাতে হয়, অ্যারেঞ্জ শক্ত বালিশ ফর গভর্নর অ্যাট সার্কিট হাউস স্টপ কনফার্ম স্টপ এ-ডি-সি গভর্নর। লাটসাহেব কি খাবেন, কি ভাবে তা রান্না হবে এবং সে খাবার অল্প না বেশি গরম খেতে উনি পছন্দ করেন, তার ছাপান সার্কুলার আছে। সুতরাং এ-ডি-সি-কে তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে না হলেও লাটসাহেবের খাবার আগে চেক-আপ করে দেখতে হয় সার্কুলারের ইজ্জত রক্ষা করা হয়েছে কিনা।

এইখানেই শেষ নয়। রাজ্যপাল ভাব ভোলা বলে তাঁর পোশাক-আসাকের দিকেও তীক্ষ্ণ নজর দিতে হয়।

আরো কিছু?

আরো কিছু আছে তবে হয়তো প্রকাশ্যে নয়। রাজাগোপালাচারী বা কৈলাশনাথ কাটজু বা হরেন মুখুজ্জের মতো গভর্নর আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজকাল অনেক রাজ্যপাল দিনে প্রহিবিশন কাউন্সিলের সভাপতিত্ব করলেও সন্ধ্যার পর স্কচ মার্কা দাওয়াই না খেলে পারেন না। সমস্ত লোকচক্ষুর আড়ালে এ-ডি-সি-কেই গেলাস বোতল সোডার ব্যবস্থা করতে হয়। একজন অতি বিশ্বস্ত বেয়ারা সাহায্য করে মাত্র। অনেক রাজ্যপাল তো পুরনো দিনের বান্ধবী দেখলে বর্তমান ভুলে যান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সদ্য পরিচিতাকে পুরনো দিনের বান্ধবী বলে চালাতে স্যুট-টাই পরা রাজ্যপালরা দ্বিধা করেন না।

ক্যাপ্টেন রায় অবশ্য ভাগ্যবান। ওর গভর্নরের বোতল বা বান্ধবীর রোগ নেই কিন্তু চাকরি করতে গিয়ে অন্য রাজ্যপালদের এসব রোগের কথা জানতে বাকি নেই। রাজভবনের বা সরকারি গাড়িতে নয়, সন্ধ্যার পর প্রাইভেট গাড়িতে লাটসাহেব যান বান্ধবী সন্দর্শনে। ব্যবস্থা করতে হয় এ-ডি-সি-কেই। সবাইকে বলতে হয়, আই অ্যাম সরি স্যার, হিজ একসেলেন্সি ইজ নট ওয়েল।'

রমজানের কাছে ডায়না-ডরোথির কাহিনি শুনতে ভালো লাগে কিন্তু চমক লাগে না ক্যাপ্টেন কমল রায়ের। তখনকার মতো এখনও সন্ধ্যার পর চোখের দৃষ্টিটা রঙিন হয়, রক্ত একটু বেশি দ্রুত চলাচল করে, নিশ্বাসে আগুনের হলকা ভেসে আসে।

মারাঠা রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন মিশ্র যখন আসাম গভর্নরের এ-ডি-সি ছিলেন, তখন তার কাছে কত কি শুনত! ঘন ঘন কলকাতা থাকতেন লাটসাহেব আর ক্যাপ্টেন রায়কেই তো খবর দিতে হতো মিসেস সরকারকে।

বত্রিশ বছর দেশ সেবার পর ট্যান্ডন সাহেব যেদিন রিটায়ার করলেন, সেইদিন সন্ধ্যাবেলাতেই

রাষ্ট্রপতি ভবনের ইস্তাহারে তার পুরস্কার ঘোষণা করা হল।...দি প্রেসিডেন্ট ইজ প্লিজড টু অ্যাপয়েন্ট...।' ট্যান্ডন সাহেব আসামের গভর্নর হলেন। প্রেসিডেন্ট একটুও খুশি হননি তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্টে। সরকারি অফিসে বড় বড় অফিসারদের পৌষ মাস খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ট্যান্ডন সাহেবের এমন দুর্দিনে তাকে রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারি করার প্রস্তাব করা হয়। প্রেসিডেন্ট নিজে ফাইলের উপর মন্তব্য লিখেছেন, 'এনি ওয়ান বাট মিঃ ট্যান্ডন!' সেই ট্যান্ডনকে প্রেসিডেন্ট ইজ প্লিজড্ টু অ্যাপয়েন্ট...।

দশ চক্রে ভগবান ভূত! ক্ষেত্র বিশেষে ও প্রয়োজন মতো অপ্রিয় অফিসারদের প্রমোশন দিয়ে দিল্লী থেকে বিতাড়ন করা হয়। ট্যান্ডন এমনি একজন অপ্রিয়-ভাগ্যবান। বত্রিশ বছর সরকারি চাকরি করতে গিয়ে কি না করেছেন?

আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দের জীবনী ছাপা হয়। কিন্তু যদি এইসব দেশপ্রেমিক একসেলেন্সিদের জীবনী ছাপা হতো, তাহলে উপন্যাস লেখার প্রয়োজন হতো না। লিখলেও বিক্রি হতো না। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব এক হাতে পবিত্র কোরাণ অন্য হাতে ধারালো ছোরা নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন বলে আজও তার নিন্দা ছাপা হচ্ছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। কিন্তু যেসব বেইমান মীরজাফরের দল এন্ডারসন বা ডায়ারে কৃপালাভ করার জন্য নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলি চালিয়েছে, কিশোর-কিশোরীদের ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়েছে, তাদের নিন্দা কোনো ইতিহাসের পাতায় লেখা হল না। লেখা হল না আরো কিছু...

পুরোদমে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। গ্রামের চাষীদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে সৈন্যদের খাওয়াবার ব্যবস্থা হল। দেশের লোকদের মুষ্টিভিক্ষা দেবার জন্য চালু হল রেশনিং। পেটের ক্ষুধা, দেহে লজ্জা নিবারণের জন্য যা যা প্রয়োজন, তার সব কিছুই রেশনিং-এর আওতায় এল। এক মুষ্টি অন্নের জন্য, এক টুকরো কাপড়ের জন্য দেশের কোটি কোটি মানুষ হাহাকার করে উঠল।

দেশের মানুষের এই সর্বনাশের দিনেই ট্যান্ডন সাহেবের পৌষ মাস ছিল। ট্যান্ডন হলে ডেপুটি কন্ট্রোলার জেনারেল অফ রেশনিং। গাল ভরা নাম হলেও আন্ডার সেক্রেটারির চাকরি আর কি! ইংরেজ কোনো গোলমালকেই বিশ্বাস করত না। ডিফেন্স বা হোম ডিপার্টমেন্টে যে দুচারজন ইন্ডিয়ান অফিসার ছিলেন, তাদের কাউকেই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা গোপনীয় কাজের ভার দেওয়া হতো না। আর যাদের দায়-দায়িত্ব দেওয়া হতো না, তারা পেতেন গাল ভরা নামে পোস্ট! ডেপুটি কন্ট্রোলার জেনারেল অফ রেশনিং ছিল এমনি এক পদ! দায়-দায়িত্ব বিশেষ না থাকলেও কয়েক হাজার লোকের অস্থায়ী চাকরি নেবার মালিক ছিলেন ট্যান্ডন সাহেব এবং সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কার্পণ্য করেননি তিনি।

চাকরির উমেদারী করতে আসার সময়ই কাপুর স্ত্রী কমলাকে নিয়ে এসেছিলেন ট্যান্ডন সাহেবের কাছে।

'সাব ছোটা সে এক নোকরি দে দিজিয়ে। বড়ই বিপদে পড়েছি।'

'চাকরি-বাকরি' নেই তো বিয়ে করলে কেন?'

কাপুর আর কমলা মাথা হেঁট করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

'এক গাদা বাচ্চা-কাচ্চাও হয়েছে নিশ্চয়ই?'

কমলা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। কাপুর চাপা গলায় জবাব দেয়, 'না সাহেব, এখনও বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি।'

লোদি রোডের বাংলোর বারান্দার দু-চারবার পায়চারি করে ট্যান্ডন সাহেব বললেন, 'চাকরি

তো টেম্পোরারি।'

'তাতেই রাজি স্যার।'

ঠোঁটটা কামড়ে এক ঝলক বিদ্যুৎ দৃষ্টি দিয়ে কমলাকে দেখে বললেন, 'রেশনিং-এর চাকরিতে তো কেবল বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে। তারপর একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, অবশ্য তাতে অ্যালাউন্স পাবে।...'

'হাঁ সাব তাতে অসুবিধা হবে না।'

'তোমার ফ্যামিলিকে কে দেখাশুনা করবে?'

কাপুর শুধু চাকরিই পেল না, তিন মাসের মধ্যে পারচেজ ইন্সপেক্টর হল। সরকারের চাল-আটা কিনতে ঘুরে বেড়াত নানা দেশ। সরকারি অ্যালাউন্স ছাড়াও উপরি-পাওনাও আসতে লাগল দু-পকেট ভরে।

ট্যান্ডন সাহেব প্রথমে সপ্তাহে একদিন, তারপর দুদিন, তারপর রোজ সন্ধ্যায় বেঙ্গলি মার্কেটের ফ্ল্যাটে গিয়ে কমলার দেখাশুনা শুরু করলেন। আরো কতজনকে দেখাশুনা করতেন কে জানে? কেউ টুঁ শব্দটি করতে পর্যন্ত সাহস করত না। টেম্পোরারি চাকরি। মুহূর্তের মধ্যে তাসের ঘর লুটিয়ে পড়বে।

ফুড ডিপার্টমেন্টের পুরনো কর্মচারীরা জানলেও এসব কাহিনি ক্যাপ্টেন রায় জানেন না। তবে হিজ একসেলেন্সি ট্যান্ডন কলকাতা এসে সন্ধ্যার অন্ধকারে ছোট্ট প্রাইভেট গাড়ি চড়ে বেহালায় মিসেস সরকারের কাছে রোজ ডিনার খেতে যেতেন, তা তো জানেন।

উর্দুতে একটা কথা আছে, 'আই-ই তো ঈদ, নেহি তো রোজা।' জুটল তো ভুরিভোজন, নয়তো অনশন। কথাটা বার বার মনে পড়ছিল ক্যাপ্টেন রায়ের।

সেদিন সকালে লাট সাহেবের কোনো ভিজিটার্স ছিলেন না। আগের দিন রাত্রি দশটা পর্যন্ত কুমারী পদ্মাবতীর নাচ দেখে এসে কি পরের দিন সকালে কাজ করা যায়? লাটসাহেব তো আর 'রাইটার্স বিল্ডিং'-এর লোয়ার ডিভিশন কেরানী নন। সরকারি বা বেসরকারি ডিনার অথবা অন্য কোনো প্রোগ্রামের জন্য রাত্রি নটা সাড়ে নটা পর্যন্ত লাটসাহেব এনগেজড থাকলে পরের দিন সকালে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে না। সরকারি প্রোগ্রাম থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। পাঁচ হাজার টাকার চাকরির জন্য যদি ভোরে উঠে গান্ধী ঘাটে মালা দিতে হয় বা দমদম এয়ারপোর্টে অজ্ঞাত অপরিচিতিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে হয় তো সে আলাদা কথা। অন্যথায় ছাপানো এনগেজমেন্টের কাগজে চব্বিশ পয়েন্টের মোটা মোটা হরফে লেখা থাকবে 'নো এনগেজমেন্ট ইন দি মর্নিং।

সাধারণত রাজভবনের অফিসাররাও জরুরি কাজ না থাকলে ওই সময় লাটসাহেবকে বিরক্ত করেন না। সকালে তাই ক্যাপ্টেন রায় সোজা এসেছেন নিজের অফিসে। কিছু কাজকর্ম ছিল। কিন্তু ঠিক মন বসল না। পাশের জানালা দিয়ে চেয়ে রইলেন দূরের নীল আকাশের দিকে।

ক্যাপ্টেন একটা সিগারেট ধরালেন। আপন মনে ভাবছিলেন গত রাত্রের কথা। 'ক্যাপ্টেন ট্রাই দিস ফাস্ট 'দিস ইজ কোত্‌লেটা পোজারস্কী।'

'আই-ই তো ঈদ, নেহি তো রোজা।'

এলাহাবাদ ইস্টার কলেজে পড়বার সময় কথাটা শিখেছিল মাথুরের কাছ থেকে।...সতীর্থ অশোক বাজপেয়ী আবার নতুন করে ভালোবাসল চন্দ্রাবলীকে। সিভিল লাইন্স-এর নির্জন পথে ঘন ঘন দেখা গেল দুজনকে। ক্লাস ফাঁকি সাইকেল নিয়ে যমজবাগের দিকে উধাও হবার খবরও

শোনা যেত মাঝে মাঝেই। অভয়া, গার্গী, ডলিদের নিয়ে যা হতো, চন্দ্রাবলীকে নিয়ে অশোক শুধু তার পুনরাবৃত্তি করছিল। নতুন কিছু নয়।

ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা, ছাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। রাগে দুঃখে, হিংসায় অনেক ছেলেমেয়েই অস্থির হয়ে উঠল। উত্তেজনা অস্থিরতা যখন চরমে, তখন মাথুর বলেছিল, 'এই তো দুনিয়া! আ-ই তো ঈদ, নেহী তো রোজা।'

হাসতে হাসতে মাথুর বলেছিল, 'অশোকের ঈদ, আমাদের রোজা!'

ইস্টার কলেজের দিনগুলো বহুদূরে চলে গেছে। বহুদিন পর এ-ডি-সি-র চাকরি করতে এসে ক্যাপ্টেন রায়ের বড় বেশি মনে পড়ছে মাথুরের কথা, 'আই-ই তো ঈদ...'

অ্যান্ডারসন, বারোজ বা লর্ড কেসি যখন বাংলার লাট ছিলেন, তখন আই-সি-এস, আই-পি-এস ছাড়া কিছু রায়-সাহেব খান-সাহেব—রায়-বাহাদুর—খান-বাহাদুরের দল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন। দেশ স্বাধীন হবার পর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার নিয়মও পাল্টে গেল। শুধু বাংলায় নয়, সারা দেশেই। সরকারি পৃষ্ঠপোশকতার জোয়ার ভাঁটা হতো। কখনও কুমিল্লা, কখনও শ্রীরামপুর! কখনও বরিশাল, কখনও বাঁকুড়া! কখনও ব্রাহ্মণ, কখনও বদ্যি। মাদ্রাজে ব্রাহ্মণ-নাদার, অন্ধ্রে, কামারেড্ডি, পাঞ্জাবে পাঠান-সর্দার-জাঠ। উত্তরপ্রদেশে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ! ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাংলাদেশে যখন নন্-ম্যাট্রিকুলেট নেতাদের রাজত্বে ঘোর কলিকাল চলছে, তখন যে কজন ব্যর্থ কেরানী রেসের ঘোড়ার মতো একলাফে অফিসার হয়েছিলেন, রাজ্যপালের স্পেশাল সেক্রেটারি মিঃ সরকার তাদের অন্যতম। যে সরকার ধুতি-পাঞ্জাবি পরে গ্যালিফ স্ট্রিটের ট্রামে চড়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ফুড ডিপার্টমেন্টের তিন তলার কোণার হল ঘরের হাতল ভাঙা চেয়ারে বসতেন, তিনি হঠাৎ থ্রি পিস স্যুট করে 'সত্যমেব জয়তে' মার্কা গাড়িতে ঘোরা-ঘুরি শুরু করলেন।

ক্যাপ্টেন রায়ের এসব জানার নয়। তবে খটকা লেগেছিল রাজভবনের ক্লার্কদের কথাবার্তা শুনে। মিঃ সরকারকে ওরা সবাই সরকার মশাই বলতেন। এবার গভর্নরের সঙ্গে জলপাইগুড়ি ট্যুরে গিয়ে ডেপুটি কমিশনারের কাছে সরকারের ইতিহাস জানতে পারেন। '...ইউ নো ক্যাপ্টেন রয়, দিস ফেলো ওয়াজ এ ক্লার্ক আন্ডার মি।'

সেই সরকার আজ শেরওয়ানি-চুড়িদার পরে, গভর্নরের বি টিম। মালেশিয়া পার্লামেন্টারি ডেলিগেশনের সদস্যরা তো সরকারকেই 'ইওর একসেলেন্সি' বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

'এক্সকিউজ মি স্যার! আই অ্যাম স্পেশাল সেক্রেটারি টু হিজ একসেলেন্সি...'

ডেলিগেশনের নেতা হাসতে হাসতে মন্তব্য করেছিলেন, 'বাট ইউ লুক লাইক এ গভর্নর!'

সেই সরকার সাহেবের মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে গত রাত্রে ডিনার খেয়েছেন ক্যাপ্টেন রায়। লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মচারী জীবন ভোর 'রোজা' পালন করা যেমন সত্য, স্পেশাল অফিসার—স্পেশাল সেক্রেটারিদের 'ঈদ'টাও তেমনি সত্য।

রাজভবনের হেড কুক পেরেরা সাহেবের খানা এ-ডি-সি-দের অপরিচিত নয় কিন্তু তবুও সরকার সাহেব বার বার বললেন, 'সুড আই গিভ ইউ অ্যানাদার কোত্‌লেটা পোজারস্কি?' রাশিয়ান অন্যান্য খাবারের চাইতে এই চিকেন কাটলেটটা আমার সব চাইতে ভালো লাগে।

'না, না, থ্যাঙ্ক ইউ! অলরেডি অনেক খেয়েছি...'

'ইউ মাস্ট হ্যাভ এনাদার! এসব কোনো হোটেল রেস্তোরাঁয় পাবেন না। আমার স্ত্রী নিজে হাতে...'

'কোথায় শিখলেন?'

'সী লার্ন'ট ইট ফ্রম রাশিয়ানস হু কেম উইথ ক্রুশ্চেভ অ্যান্ড বুলগানিন।'

'আই সী! একটা দিন!'

ক্যাপ্টেন মনে মনে পেরেরাকে ধন্যবাদ জানায়।

প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার বা অন্যান্য রাজ্যের গভর্নর ছাড়াও বহু অতিথির আগমন হয় রাজভবনে। প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিস্টারের মতো ভি-আই-পি-দের সিকিউরিটির জন্য, নিরাপত্তার জন্য রাজভবনের থাকতেই হয়? এদের পক্ষে অন্যত্র থাকা নাকি নিরাপদ নয়।

ভারতবর্ষের মতো সিকিউরিটির কদর্যতা আর কোথাও দেখা যাবে না। নিজের দেশের মানুষকে এমন ভাবে দূরে বহুদূরে রাখার নজির আর কোনো দেশে নেই। লর্ড ওয়েলেসলি, স্যার জন অ্যান্ডারসনই আমাদের পূর্বসুরী থেকে গেলেন। স্যার জন অ্যান্ডারসন প্রতিটি ভারতবাসীকে সন্দেহের চোখে দেখতেন ; মনে করতেন প্রতি ভারতবাসীর পকেটেই টাইম বোমা থাকে। সরকারি গোলামের দল কনস্টেবল সাবইনসপেক্টরদের বিশ্বাস করবেন কিন্তু হেডমাস্টার-প্রফেসর ভাইস চ্যান্সেলারকেও ঠিক সন্দেহের ঊর্ধ্বে মনে করতে পারেন না।

আর্মিতে সিকিউরিটি হচ্ছে মূলমন্ত্র। দেশরক্ষার জন্য গোপনে কত কি করতে হয়। একজন সুবেদার বিশ্বাসঘাতকতা করলে দেশের কি ভীষণ সর্বনাশ হতে পারে কিন্তু সেখানেও মানুষকে এমনভাবে ঘৃণা বা অবিশ্বাস করা হয় না।

রাজভবনের ভি-আই-পি সিকিউরিটির ব্যবস্থা দেখে ক্যাপ্টেন রায় স্তম্ভিত হন। অজ্ঞাত জুজুর ভয়ে এদের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসিও পায়।

পাবে না?

ওই বিরাট লোহার ফটকের ওপাশ থেকে যারা রাজভবনকে দেখে, বর্শা হাতে নিয়ে ঘোড়-সওয়ার পুলিশ দেখে যারা শুধু মজা পায়, তারা না হয় সব কিছু জানে না, জানতে পারে না। যাঁরা কালে কস্মিনে রাজভবনে আসেন বা মার্বেল হলে কাউন্সিল চেম্বারে ভি-ভি-আই-পি দর্শনের পরম সৌভাগ্যলাভ করেন, তাঁরাও হয়তো সবাইকে চিনতে পারেন না। কিন্তু এ-ডি-সি তো সবাইকে চেনেন, জানেন। সবকিছুই দেখেন।

গেটের বাইরে দুচারটে বেতার গাড়ি, দুচার লরি বোঝাই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। ভিতরে? ভিতরে প্রতি পদক্ষেপে ভি-ভি-আই-পি-দের অভিভাবকের দল। বাছাই করা অভিভাবকের দল। রাজভবনের বারান্দায় লিফট-এর পাশে, প্রিন্স অফ ওয়েলস স্যুইটের মুখে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের অমন করে চৌকিদার দারোয়ানী করতে দেখে ক্যাপ্টেন রায় না হেসে পারেন না। রাজভবনের বাইরে থেকে কামানের গোলা ছুঁড়লেও যেখানে পৌঁছাবে না, সেখানেও এই সতর্কতা? নাকি মেন গেটের সশস্ত্র বাহিনীকে পরাস্ত করে যদি কোনো অবিমৃষ্যকারী ঢুকে পড়ে ভিতরে?

এসব ভি-ভি-আই-পি এলে রাজভবনের সমস্ত কর্মচারীদের প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। সমস্ত কাজকর্ম জীবনযাত্রা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। ঠিক কাজের চাপ, দায়িত্বের বোঝা যে খুব বেশি থাকে তা নয়। অধিকাংশ সময়েই অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অথবা খিদ্‌মদগার হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। গভর্নরের সেক্রেটারি, স্পেশাল সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি, এ-ডি-সি থেকে বেয়ারা-চাপরাশিদের ওই একই অবস্থা। মনে-মনে বিরক্তবোধ করে সবাই, মুখে প্রকাশ করে না কেউই। বিদেশি ভি-আই-পি এলে বেয়ারা-চাপরাশিদের অদৃষ্টে কিছু

প্রাপ্তিযোগ ঘটে। আর ইন্ডিয়ান ভি-আই-পি এলে প্রাইভেট সেক্রেটারির বাথ টাওয়েলের হিসাব না মেলার জন্য মাইনে থেকে খেসারত দিতে হয়।

সহিদাদুল্লা তো স্পষ্টই বলে, 'আরে ছোড়িয়ে সাব–। বড়া মিনিস্টার বা লাটসাব হলেই দিল বড় হয় না। আমরা গরিব হতে পারি কিন্তু বাথরুম থেকে তোয়ালে বা ড্রইংরুম থেকে বই নিয়ে চলে যাব না।'

গঙ্গা সিং বলেছিল, 'কি আর বলব সাহেব? কিছু কিছু সাহেব আছেন যাঁরা ডিনারের ফলমূল পর্যন্ত নিয়ে যেতে দ্বিধা করেন না।'

অবাক হয়ে ক্যাপ্টেন রায় বলেছিলেন, 'কি বলছ?'

'বিশ্বাস না হয় হেড ক্লার্কবাবুকে জিজ্ঞাসা করবেন। ওর কাছে আরো অনেক কিছু জানতে পারবেন।'

এসব নোংরামি ঘাঁটাঘাঁটি করতে ক্যাপ্টেন রায় উৎসাহবোধ করেন না। হেডক্লার্ক মজুমদার বাবুকে তিনি কিছুই জিজ্ঞাসা করেননি তবুও কানে ভেসে এসেছে অনেক কাহিনি।

ভি-আই-পি-দের নামে স্পেশাল সেক্রেটারি বা ডেপুটি সেক্রেটারিরও উপরি পাওনা নেহাত মন্দ হয় না। ফরেন ভি-আই-পি এলে প্রতিটি গেস্টের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয় ইমপোর্টেড ওয়াইন বা অ্যালকোহলের বোতল। সবাই মদ খান না ; খেলেও এক বোতল কেউই খান না, খেতে পারেন না। পরের দিন সকালে পুরুত ঠাকুর ডেপুটি-স্পেশাল সেক্রেটারির বাড়িতে পৌঁছে যায় এই বোতল বোতল নৈবেদ্য। সীল ভাঙা বোতল তো আর কোনো গেস্টকে দেওয়া যায় না।

ক্যাপ্টেন রায় এসব জানতেন না। একবার আমজাদ আলি এক বোতল স্কচ পৌঁছে দেয় ওর ঘরে। হঠাৎ এক বোতল স্কচ পেয়ে মনটা আনন্দিত হলেও বিস্মিত হয়েছিলেন।

'কি ব্যাপার? স্কচের বোতল?'

'জি হ্যাঁ সাব। এটা আপনার।'

বোতলটা হাতে নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে এ-ডি-সি সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'টাকা দিতে হবে না?'

'নেহি সাব। টাকা পয়সা দিতে হবে না।'

'গভর্নর সাব পাঠিয়েছেন?'

এবার আমজাদ হেসে ফেলে, 'না সাব লাটসাব কি শরাব পাঠাতে পারেন?'

'তবে?'

আমজাদ আর চেপে রাখতে পারেনি। গড় গড় করে সব বলেছিল।

'বোতলটা ফেরত দিয়ে সাহেবকে আমার সেলাম দিও।'

পরে একদিন আমজাদকে বলেছিলেন, 'একটু আধটু ড্রিংক করি বটে তবে বিনা পয়সায় নয়। আর্মি অফিসারদের কাছে মদ জোগাড় করা খুব কঠিন কাজ নয়। দরকার হলে আমি ফোর্ট উইলিয়াম ক্যান্টিন থেকেই আনতে পারব।'

ওই ঘোড়ার আস্তাবল বা মোটর গ্যারেজের উপরে যে অফিসারগুলো থাকে, তাদের মনোবৃত্তি যে কেমন বিচিত্র হয়!

যাকগে ওসব। রাজভবনে তো শুধু ভি-ভি-আই-পি-রাই থাকেন না, আরো অনেকে থাকেন। এখানে এক অতিথির আগমন হয়েছিল বলেই তো মণিকার সঙ্গে ক্যাপ্টেন রায়ের প্রথম আলাপ হয়।

ক্যাপ্টেন কমল রায়ের মানসী, মণিমালা মণিকা ব্যানার্জি।

...রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটির রেক্টর উ মঙ এলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ দিতে। বার্মার সঙ্গে ভারতের বিশেষ সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাঁকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হবার সাদর আমন্ত্রণ জানান। উ মঙ সানন্দে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তারপর মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ মতো পশ্চিমবাংলার গভর্নর তাঁকে তিনদিনের জন্য ব্যক্তিগত অতিথি হবার অনুরোধ জানান।

এসব ক্যাপ্টেন রায় জানতেন। উ মঙকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে গিয়েছিলেন ওর সহকর্মী। পরের দিন সকালে গভর্নরের সঙ্গে উ মঙের সৌজন্য সাক্ষাৎকার করাবার দায়িত্ব ছিল ক্যাপ্টেন রায়ের। যেসব অতিথিদের সঙ্গে প্রাইভেট সেক্রেটারি থাকেন না, তাঁদের এনগেজমেন্ট প্রোগ্রাম সম্পর্কে এ-ডি-সি'দের একটু খেয়াল রাখতে হয়।

আমজাদের ব্রেকফাস্ট খেয়ে, সিঁড়ির মুখে লর্ড ওয়েলেসলীর পেন্টিং-এর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে ভক্তি জানিয়ে ক্যাপ্টেন রায় ঠিক আটটায় গভর্নরকে সেলাম জানাতে গেলেন।

'প্লিজ লুকআফটার প্রফেসর মঙ। হাজার হোক বৃদ্ধ মানুষ, তারপর সাহায্য করার কেউ নেই।'

মাথা নিচু করে এ-ডি-সি জানান, 'সার্টেনলি স্যার।'

'ইফ দেয়ার ইজ নো আদার সিরিয়াস ওয়ার্ক তাহলে এই তিনদিন তুমি ওর সঙ্গে সঙ্গে একটু থেকো।'

'পারফেক্টলি অল রাইট, স্যার! আমি তিনদিনই ওর সঙ্গে থাকব।'

গভর্নরের প্রস্তাবে ক্যাপ্টেন খুশিই হন। এসব গেস্টদের দেখাশুনা করতে কোনো ঝামেলা নেই। গভর্নরের সঙ্গে ওর দেখা করার কথা পৌনে নটায়। তবুও সওয়া আটটা বাজতে না বাজতেই ক্যাপ্টেন রায় প্রফেসর মঙের দরজায় নক করলেন।

মিনিট খানেক পরে যিনি দরজা খুলে দিলেন, ঠিক মহিলাও নন, একজন যুবতী। সাধারণ ভারতীয় মেয়েদের মতো শাড়ি পরা মেয়ে। দেখে অধ্যাপক মঙের স্ত্রী বা মেয়ে বলেও মনে হল না।

তবে?

মনের দ্বিধা মনেই রাখলাম! 'গুডমর্নিং।'

'আই অ্যাম ক্যাপ্টেন রয়, এ-ডিসি টু দ্য গভর্নর।'

বিচিত্র ঔৎসুক্যভরা সলজ্জ দৃষ্টি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে এ-ডি-সি-কে দেখে নেবার পর উনি বলেছিলেন, 'গুডমর্নিং!'

তারপর মিষ্টি গলায় শুদ্ধ বাংলায়, 'আসুন ভিতরে আসুন।'

বাচালতা, চপলতা এ-ডি-সি-র জন্য নয়। মুখে কিছু বলেননি ক্যাপ্টেন রায়। তবে মুচকি হেসে ভালো করে একবার দেখেছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন-সম্রাজ্ঞীকে।

সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ অধ্যাপক বড় কৌচের একপাশে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

'এক্সকিউজ মি স্যার, আমি গভর্নরের এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন রয়।'

'কাম অন অফিসার, এদিকে বসো।'

সম্মানিত অতিথিদের পাশে বসার বাধা না থাকলেও চলন নেই। ক্যাপ্টেন রায় সঙ্কোচের সঙ্গে সকৃতজ্ঞ হয়ে ধন্যবাদ জানালেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার!'

মণিকার বেশ লাগছিল। কথায় কথায় থ্যাঙ্ক ইউ।

গোল গোল রূপোর ফ্রেমের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধও একটু সকৌতুক দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিলেন ক্যাপ্টেন রায়কে।

তিনটি দিন বেশ কেটেছিল। ক্যাপ্টেন রায়ের স্মৃতিতে অমর অক্ষয় হয়ে রয়েছে ওই তিনটি অবিস্মরণীয় দিনের কথা, কাহিনি।

অধ্যাপক মঙ যখন রেঙ্গুনে ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার, মণিকার বাবা ডক্টর ব্যানার্জি তখন ওখানে ভিজিটিং প্রফেসর হয়েছিলেন দুবছরের জন্য। মণিকা তখন ভিক্টোরিয়াতে বি-এ পড়ে। একমাত্র সন্তান হয়েও বাবা-মার সঙ্গে রেঙ্গুনে যেতে পারেনি। হোস্টেলেই থাকত। ছুটিতে রেঙ্গুনে যেতো।

অধ্যাপক মঙ মণিকাকে বলতেন, 'মাই সুইট লিটল মাদার।'

পরে এই বৃদ্ধের আগ্রহেই মণিকা রেঙ্গুনে এম-এ পড়ে।

অধ্যাপক ডক্টর ব্যানার্জিকে আরো দুবছর রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে রেখেছিলেন শুধু মণিকার জন্য। এম-এ পাশ করার পর সবাই চলে এলেন কলকাতা।

ব্যানার্জি পরিবার কলকাতা চলে এলেও ভুলতে পারলেন না স্নেহাতুর বৃদ্ধ অধ্যাপক মঙকে। আর মণিকা? সে তো সারা জীবনেও ভুলতে পারবে না তার এই বৃদ্ধ সন্তানকে। বিপত্নীক অধ্যাপক মঙের একমাত্র পুত্র–উ থান একেবারে উত্তরে কাচিনে হীরার কারখানায় কাজ করত। বছরে একবারের বেশি ছুটি পেত না। পুরনো দুটি কর্মচারী ছাড়া বৃদ্ধকে দেখার কেউ ছিল না। মণিকা মনে মনে বড় দুঃখ পেত বৃদ্ধের কথা ভেবে। তাইতো বড় বেশি জড়িয়ে পড়েছিল বৃদ্ধের সঙ্গে।

বিকালবেলায় দুজনে মিলে বেড়াতে যেতেন। কোনোদিন গোল্ডেন প্যাগোডায় বা ইনিয়া লেকের ধারে। অথবা অন্য কোথাও। কত কথা হতো দুজনের।

'আচ্ছা আংকেল, আপনার ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন না কেন?'

মণিকা জানতে চাইতো।

বৃদ্ধ হাসতে হাসতে জবাব দেন, 'ঠিক বলেছ মা। একবার একটি মেয়ে পছন্দও হয়েছিল কিন্তু মেয়েটির জন্মবার নিয়েই গণ্ডগোল হল।'

অবাক হয় মণিকা, 'তার মানে?'

'বুঝলে তোমাদের মতো আমাদের বিয়েরও কতকগুলো নিয়ম-কানুন আছে। ছেলেমেয়ের জন্মবার এক হলে আমাদের বিয়ে হয় না।'

'তাই নাকি?'

'থানানের জন্ম সোমবার। মেয়েটিও সোমবারে জন্মেছে। তাই...'

'আরো তো মেয়ে আছে।'

নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'আছে বৈকি মা। তবে বিয়ে-টিয়ে কি চটপট হবার জিনিস?'

মণিকা তবুও থামে না। 'কিন্তু আপনি কতকাল এমনি একলা একলা কাটাবেন?'

ইনিয়া লেকের জলে হয়তো মুহূর্তের জন্য নিজের অদৃষ্টের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান। 'সব মেয়েই যে তোমার মতো আমার কথা ভাববে তার কি মানে আছে?'

'না, না, ওকি কথা বলছেন? তাছাড়া নাতি-নাতনি তো আপনার কাছে থাকতে পারবে।'

'অত শত আমি আশা করি না।' নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ নিরাশক্তের মতো জবাব দেন।

গোল্ডেন প্যাগোডার ধারে বেড়াতে বেড়াতে কোনো কোনোদিন বৃদ্ধ বলেন, 'তার চাইতে তুমি বিয়ে কর। আমি কলকাতায় তোমার কাছেই থাকব আর মাঝে মাঝে একটু বোদ্ধগয়া ঘুরে আসব।'

বৃদ্ধের সঙ্গে মণিকার সম্পর্কই আলাদা। 'আমার স্বামী যদি খারাপ হয়?'

মণিকার মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মঙ বললেন, 'এই বুঝি দুষ্টুমি শুরু হল?'

এই অধ্যাপক মঙ আর মণিকাকে নিয়ে তিনটি দিন ক্যাপ্টেন রায়ের বড় আনন্দে কেটেছিল।

'ক্যাপ্টেন, ইউ উইল নেভার ফাইন্ড এ বেটার গার্ল দ্যান মণিকা।' বৃদ্ধ যেন একটু গর্ব অনুভব করেন মণিকার কথা বলতে। আত্ম তৃপ্তিভরা হাসি মুখে একবার মণিকাকে দেখে নিয়ে বলেন, 'লেখাপড়ায় যদি আর একটু ভালো হতো...'

মণিকা সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছিল বলে বুড়োর মনে বড় দুঃখ।

'...গান বাজনা আর সংসারের প্রতি এত আকর্ষণ হলে কি লেখাপড়া হয়?'

বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন ক্যাপ্টেন রায়কে।

ক্যাপ্টেন রায় এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে? কথার মোড় ঘোরাবার জন্য মণিকার দিকে ফিরে বলে, 'একদিন গান শোনাবেন তো?'

বৃদ্ধ গর্জে ওঠেন, 'হোয়াট ডু ইউ মিন বাই 'শোনাবেন তো?' আজ ইভনিং...এ-ই এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ফিরে এলে গান হবে।'

পাশের কৌচে মুখ নিচু করে বসে থাকে মণিকা।

বৃদ্ধের প্রস্তাবে খুশি হয় ক্যাপ্টেন রায়, 'খুব ভালো হবে।'

'বাট...।' বৃদ্ধ যেন কোথায় খটকা বোধ করলেন।

ক্যাপ্টেন আর মণিকা একসঙ্গেই বৃদ্ধের দিকে তাকায়।

'তোমাদের এই রাজভবনে ঠিক জমবে না। তার চাইতে অন্য কোথাও...'

এশিয়াটিক সোসাইটিতে অধ্যাপক মঙের সম্বর্ধনা সভা শেষ হবার পর সন্ধ্যার অন্ধকারে তিনজনে চলে গিয়েছিল শহর থেকে দূরে।

বৃদ্ধ বলেছিলেন, 'শুরু কর মা, সময় নষ্ট করো না।'

মণিকা জানতে চাইল, 'শুধু গীতাঞ্জলির গান?'

'একশো বার!'

একের পর এক গান শুনিয়েছিল মণিকা।

গান শুনতে শুনতে বিভোর হয়েছিলেন অধ্যাপক মঙ। বেশ কিছুক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে এলে বললেন, 'ওনলি এ সঙ, ফিলসফার লাইক টেগোর ক্যান রাইট দিস। এমন করে আত্মসমর্পণ আর কে করতে পারে?'

কলকাতা ফেরার পথে অধ্যাপক এ-ডি-সি-কে বলেছিলেন, 'শুধু গভর্নমেন্ট হাউসের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রেখো না। মাঝে মাঝে আমার মায়ের কাছে গিয়ে গান শুনে এসো।'

এক ঝলক মণিকাকে দেখে নিয়ে ক্যাপ্টেন রায় বলেছিলেন, 'স্যার আপনি চলে গেলে কি উনি চিনতে পারবেন?'

এবার আর মণিকা চুপ করে থাকেনি, 'বরং আপনিই চিনতে পারবেন না। গভর্নমেন্ট হাউসে থেকে কি আমাদের মতো সাধারণ মেয়েদের মনে রাখা সম্ভব?'

'তাই নাকি?'

অধ্যাপক মঙের কলকাতা ত্যাগের পূর্বসন্ধ্যায় ব্যানার্জিগৃহে ক্যাপ্টেন রায়ের প্রথম পদার্পণ

হয়। সে সন্ধ্যায় বাইরের বিশেষ কেউ ছিলেন না। শুধু তরুণ বার্মিজ কন্সাল জেনারেল এসেছিলেন, সরকারি পদমর্যাদার জন্য নয় ডক্টর ব্যানার্জির ছাত্র হিসেবে। ভাত মাছ তরকারি রান্না করেছিলেন মণিকার মা। মণিকা রান্না করেছিল মঙের প্রিয় মহিঙ্গা।

ক্যাপ্টেন রায় অবাক হয়েছিলেন, 'আপনি বার্মিজ রান্নাও জানেন?'

'এই একটু আধটু।'

মণিকার মা বললেন, 'আমি এতদিন রেঙ্গুনে থেকেও শিখতে পারলাম না অথচ মণিকা...'

খেতে খেতে হঠাৎ থেমে গেলেন অধ্যাপক মঙ, 'গতজন্মে ও বার্মিজ ছিল।'

ক্যাপ্টেন রায় হাসতে হাসতে বলেন, 'মনে হয় আপনার কথাই ঠিক।'

সে রাত্রে বিদায় নেবার সময় ডক্টর আর মিসেস ব্যানার্জি দু'জনেই বলেছিলেন, 'সময় পেলেই চলে এসো।'

'নিশ্চয়ই।'

পরের দিন সকালে অধ্যাপক মঙ বেনারস চলে গেলেন। এয়ারপোর্টে বিদায় জানাতে অনেকেই এসেছিলেন। ডক্টর ব্যানার্জি আর মণিকাও এসেছিল। ডক্টর ব্যানার্জি ভাইস চ্যান্সেলার ডক্টর সেনগুপ্তের সঙ্গে চলে গেলেন। ক্যাপ্টেন রায় মণিকাকে বললেন, 'যদি আপত্তি না থাকে তো আমার আস্তানায় এক কাপ কফি খেয়ে যান।'

রাজভবনের গাড়িতে ক্যাপ্টেন রায় আর মণিকা রওনা হল গভর্নমেন্ট হাউসের দিকে।

রাজভবনেব পোর্টিকোতে গাড়ি থামতেই তকমা আঁটা বেয়ারা এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। এ-ডি-সি সাহেবের সঙ্গে মণিকাকে দেখে মার্বেল হলের এপাশে ওপাশে যে সব বেয়ারারা ছিল, তারা সবাই একটু অবাক হল। আগে কোনো কোনো এ-ডি-সি-কে ওরা গার্ল নিয়ে আসতে দেখেছে, কিন্তু ক্যাপ্টেন রায় কোনোদিন কাউকে নিয়ে আসেননি।

আশপাশের বেয়ারারা মুখে কিছু বলল না, বলতে পারে না, শুধু সেলাম দিল।

লিফট্‌ম্যানও সেলাম দিয়ে উপরে নিয়ে গেল। করিডোরের বেয়ারারাও সেলাম দিল। সেলাম কুড়ুতে কুড়ুতে ক্যাপ্টেন রায় মণিকাকে নিয়ে নিজের ঘরের দরজায় এলেন। সেখানেও একটা বেয়ারা সেলাম দিয়ে দরজা খুলে দিল।

ক্যাপ্টেন রায় মাথার টুপিটা খুলে সসম্ভ্রমে দরজা দেখিয়ে বললেন, 'প্লিজ।'

একটু মুচকি হেসে মণিকা ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল, 'এখানে কিভাবে থাকেন বলুন তো?'

'কেন বলুন তো? আমার ঘরটা কি এত খারাপ?'

চোখ থেকে সানগ্লাস খুলতে খুলতে মণিকা বলে, 'আপনার ঘরের কথা বলছি না বলছি এই রাজভবনের কথা।'

অবাক হয় ক্যাপ্টেন রায়, 'রাজভবনের আবার কী হল।'

একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মণিকা আবার বলে, 'মাই গড! সে বোধশক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন?'

'এক্সকিউজ মি...'

মণিকা নিজের মুখের সামনে একটা আঙুল তুলে বললে, 'এই ফর্মালিটিগুলো ছেড়ে কথা বলতে পারেন না?'

অনেকটা নিশ্চিন্তবোধ করে ক্যাপ্টেন রায়। দু'এক পা এগিয়ে এসে একটা কৌচের টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'বাট হোয়াট হ্যাপেনড্ টু রাজভবন?'

'প্রাণহীন পুতুলের মতো এই লোকগুলোর সেলাম নিতে বুঝি আপনার খুব ভালো লাগে?'

ক্যাপ্টেন রায় এবার হেসে ফেলে। 'প্লিজ হ্যাভ ইওর সিট...'

'আবার প্লিজ?'

'আই অ্যাম সরি।'

'শুধু দুঃখ প্রকাশ করলেই চলবে না। প্রতিজ্ঞা করুন আমার সঙ্গে ওই ধরনের ফর্ম্যাল কথাবার্তা বলবেন না।'

ক্যাপ্টেন রায় যেন হঠাৎ একটু দুষ্টুমি করে একটু চাপা গলায় জানতে চায়, 'যদি বেশি ইনফর্ম্যাল হই?'

মণিকা এবার ব্রেক করে, 'আপনি আমাকে কফি খাওয়াবেন বলে এখানে এনেছেন। সেকথা মনে আছে কি?'

'আই অ্যাম সরি...'

ক্যাপ্টেন রায় বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে তলব করল। 'আমজাদ আভি ডিউটিমে হ্যায়?'

'হ্যাঁ সাব।'

'পাঠিয়ে দাও তো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমজাদ এসে দু'জনকেই সেলাম দিল।

'আমজাদ, এই মেমসাহেব আমার পয়লা মেহমান। একটু ভালো করে কফি-টফি খাওয়াবে?'

'জরুর।'

'তাহলে জলদি লে আও।'

এতকাল রাজভবনে কাজ করে মেহমানের মর্যাদা বোঝে আমজাদ আলি। তাইতো, শুধু কফি আনেনি, এনেছিল ডবল ডিমের ওমলেট, কেক, পেস্ট্রি, ক্যাসুনাটস ও আরো কি যেন।

মণিকা ঘাড় বাঁকা করে ক্যাপ্টেন রায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো?'

'কেন? কি হল আবার?'

'সামনে ট্রে দেখেও বুঝতে পারছেন না কি হল?'

হাসতে হাসতে ক্যাপ্টেন রায় বলে, 'আই সি! কিন্তু আমি জানতাম বার্মিজ মেয়েরা বেশ খেতে পারে।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

'না, না, আমি কিছু মিন করছি না তবে...'

'তবে-টবে ছাড়ুন। এক কাপ কফি খাওয়াতে এনে যা ইচ্ছে তাই বলে যাবেন?'

কেন যে অহেতুক দু'জনে তর্ক করল, তা ওরা কেউ জানে না। মনে যখন ঝঙ্কার লাগে, দূর থেকে যখন একটা অস্পষ্ট স্বপ্ন উঁকি দেয়, তখন বোধহয় এমনি হয়। সবারই হয়। ক্যাপ্টেন-মণিকার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটল না।

ক্যাপ্টেন সকালে শুধু এক কাপ চা খেয়েই এয়ারপোর্টে গিয়েছিল। বেশ খিদে লেগেছিল।

'আপনি ভদ্রতা করলেও করতে পারেন ; আমার কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

'নিশ্চয়ই।' বলে নিজেই ক্যাপ্টেনকে খাবার-দাবার এগিয়ে দিল। নিজেও দু'চারটে নাটস মুখে দিল।

ক্যাপ্টেন নিজেই কফি করতে হাত বাড়ালে মণিকা বাধা দিল। 'থাক, থাক। আমি থাকতে আপনাকে আর নিজে হাতে কফি তৈরি করতে হবে না।'

'আই অ্যাম এক্সট্রিমলি গ্রেটফুল ফর দি কাইন্ড কন্সিডারেশন।'

'আবার ভদ্রতা? অত ভদ্রতা করলে এক্ষুনি চলে যাব।'

'অভদ্রতা করলে অনেকক্ষণ থাকবেন?' চাপা হাসি হাসতে হাসতে ক্যাপ্টেন রায় জানতে চান।

মণিকাও হাসতে হাসতে জবাব দেয়, 'ভদ্রতা-অভদ্রতা কিছুই করতে হবে না! স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলুন। একটু গল্পগুজব করেই পালাই।

ক্যাপ্টেন যেন উদ্বিগ্ন হয়, এক্ষুনি যাবেন?'

'যাব না?'

ক্যাপ্টেন একটু আনমনা হয়। কৌচ থেকে উঠে একবার জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কোনো সুদূরের দিকে একবার দেখে নেয়। প্যান্টের পকেটে দুটো হাত পুরে ধীরে ধীরে ফিরে আসে মণিকার দিকে।

'জানেন মিস ব্যানার্জি, কলকাতায় আসার পর আপনিই আমার ফার্স্ট ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফার্স্ট গেস্ট।'

মণিকা যেন আঘাত পেল তার দরদী মনে। 'কেন, এখানে আপনার কেউ নেই?'

'না।'

'সময় কাটান কিভাবে?'

'সময়?' রাজভবনের শাসন অমান্য করেই ক্যাপ্টেন রায়ের একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। 'ডিউটির পর চুপচাপ শুয়ে শুয়ে বইপত্তর পড়ি, নয়তো এই বেয়ারা-চাপরাশিদের সঙ্গে গল্পগুজব করি।'

ডক্টর মণ্ডের নিঃসঙ্গতার বেদনা অনুভব করত যে মণিকা, সে যেন ক্যাপ্টেন রায়ের নিঃসঙ্গতার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠল। 'কলকাতায় আপনার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই?'

'না।'

'এমন করে একলা থাকেন কিভাবে?'

ক্যাপ্টেন কোনো জবাব দেয় না। কি জবাব দেবে? মণিকাও চুপ করে বসে বসে নিঃসঙ্গ, বন্ধুহীন প্রিয়হীন ক্যাপ্টেনকে দেখে আর মনে মনে অস্বস্তিবোধ করে।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। ক্যাপ্টেন রায়ের আবার মনে পড়ে, সে এ-ডি-সি! সে রাজভবনে রয়েছে।

'আই অ্যাম সরি মিস ব্যানার্জি। কতকগুলো আজেবাজে কথা বললাম বলে মনে কিছু করবেন না।'

'না না মনে করব কেন?'

আবার কয়েকটা মুহূর্ত চুপচাপ। ক্যাপ্টেন আবার বলেন, 'একলা বেশ ছিলাম। দুঃখ কষ্টটা ঠিক অনুভব করতাম না। কিন্তু এই কদিন আপনার সঙ্গে আলাপ করে ঘোরাঘুরি করে নিঃসঙ্গতার বেদনাটা যেন প্রথম অনুভব করলাম।'

মণিকা হাসল।

'আপনি হাসছেন?'

'একটা কথা মনে হল।'

'কি কথা?'

'সেদিন সকালে যখন আপনাকে প্রথম দেখি তখন ভাবতে পারিনি আপনি এত লোনলি! আপনার হাসিখুশি ভরা মুখ আর স্মার্ট ব্যবহার দেখে ভেবেছিলাম ইউ আর দি হ্যাপিয়েস্ট ম্যান ইন দিস ওয়ার্লড।'

ক্যাপ্টেন হাসতে হাসতে দুটো লাইন আবৃত্তি করলেন, 'The wind blows out of the gates of the day, the wind blows over the lonely of heart...ওসব বাইরের ঝোড়ো হাওয়া...'

ক্যাপ্টেন আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মণিকা বাধা দিল, 'আপনি তো বেশ মজার লোক।'

'কেন বলুন তো?'

'ইয়েটস্‌কেও মুখস্থ রেখেছেন?'

ক্যাপ্টেন কোনো কথা না বলে সামনের সেন্টার টেবিলে রাখা সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে মুখে তুলে নেয়। লাইটারটাও হাতে তুলেছিল কিন্তু মণিকা হাত থেকে নিয়ে নিল, 'আমি জ্বালিয়ে দিচ্ছি।'

মণিকা লাইটার জ্বালতেই ক্যাপ্টেন সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ধন্যবাদ।'

'কিছু ধন্যবাদ দিতে হবে না। এটা আমার হ্যাবিট হয়ে গেছে। ডক্টর মণ্ড চুরুট তুললেই আমি লাইটার জ্বেলে ধরতাম।'

'Lord, lift thou up the light of thy countenance upon us.'

মণিকা হাসতে হাসতে বলে, 'আই উইস আই ওয়াজ ইওর লর্ড!'

'এই অন্ধকারে যখন একবার আলো জ্বালিয়েছেন, তখন লর্ড না বলে অস্বীকার করতে পারি?'

মণিকার সঙ্গে এই ভাবেই আলাপ। আরো অনেক মেয়ের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে। নানা জায়গায়, নানা ভাবে। আম্বালা ক্যান্টে থাকার সময় দুর্গাপুজো নিয়ে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল মনীষার সঙ্গে। জীপে চড়ে সারা ক্যান্টনমেন্ট ঘুরেছে দিনের পর দিন, চাঁদা তুলেছে প্রতিটি কোয়ার্টার থেকে। বিজয়ার দিন মা দুর্গার স্বামীর ঘর করতে চলে যাবার পরও সে সম্পর্ক হারিয়ে যায়নি। হায়দ্রবাদে থাকার সময় বাঙালিদের নববর্ষ উৎসবে আলাপ হয়েছিল সীমার সঙ্গে। আরো কত জনের সঙ্গে এমনি আলাপ হয়েছে। কিন্তু এবারের সুর যেন আলাদা। স্বতন্ত্র। হয়তো বা অনন্য।

ক্যাপ্টেন রায়ের বার বার মনে হল মণিকা চলে গেলেও কি যেন রেখে গেছে, কি যেন নিয়ে গেছে। সব কিছু ঠিক ছিল, কিন্তু তবুও যেন একটা লেনদেন হয়ে গেছে দু'জনেরই অজ্ঞাতসারে।

দিনগুলো শুরু হতো, শেষ হতো ঠিক আগেরই মতো। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে শুয়ে শুয়েই খবরের কাগজে লাটসাহেবের ছবি দেখা, আমজাদের দেওয়া ব্রেকফাস্ট খাওয়া, তাড়াহুড়ো করে ইউনিফর্ম চেক করা, হাতে স্যাফরন কলারের আর্ম ব্যাচ পরা থেকে শুরু করে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার মুখে লর্ড ওয়েলেসলীর বিরাট পেন্টিংটার সামনে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, 'গুডমর্নিং লর্ড!'

ঘড়ির কাঁটার মতো সব কিছুই আগের মতো চলছিল। কিন্তু তবুও কেমন ব্যতিক্রম মনে

হচ্ছিল ক্যাপ্টেনের। অফিস ঘরের জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে যে ক্যাপ্টেন শুধু দূরের ফুলের মেলা দেখতেন, সেই ক্যাপ্টেন টিউলিপ বা লিলির গোছা নিয়ে নিজের ঘরে রাখতে শুরু করলেন। টিউলিপ লিলির বিনম্র সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে হয়তো মণিকাকে দেখতেন।

একে আর্মি অফিসার তার উপর লাটসাহেবের এ-ডি-সি। ভদ্রতা, সৌন্দর্য শৃঙ্খল দিয়ে মনকে বন্দী করতে চেষ্টা করতেন সর্বদা। টেলিফোন ডাইরেক্টরীতে ডক্টর ব্যানার্জির নাম্বারের পাশে লাল পেন্সিসের নিশানা দিয়েছিল কিন্তু তবুও ডায়াল ঘোরাতে পারেনি।

ডিউটির পর একলা একলা চুপচাপ শুয়ে থাকে নিজের ঘরে। মোরাভিয়াকে পড়তেও ঠিক মন বসে না।

দু'দিনের জন্য লাটসাহেবের সঙ্গে মেদিনীপুর ঘুরে এলেন। সেদিন গভর্নরের বিশেষ কোনো প্রোগ্রাম ছিল না। শুধু বিকেলে কাউন্সিল চেম্বারে স্টেট লেপ্রসি বোর্ডের একটা মিটিং ছিল। ডিউটিতে ছিল লেফটেন্যান্ট ধীলন। ক্যাপ্টেনের অফ ছিল। দুপুরে ফোর্ট উইলিয়ামে গিয়েছিলেন এক বন্ধুর সঙ্গে লাঞ্চ খেতে। ফিরে এলেন প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ। শুয়ে শুয়ে বইবত্তর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল টেলিফোনের জন্য।...'ইয়েস ক্যাপ্টেন রায়...।'

গলাটা শুনেই চমকে উঠলেন, 'কে?'

'আমি মণিকা ব্যানার্জি বলছি।'

মণিকা দেখতে পেল না ক্যাপ্টেন আনন্দে লাফিয়ে উঠে বসলেন। 'বলুন কেমন আছেন?'

'মেদিনীপুর থেকে ঘুরে এলেন?'

'আপনি জানলেন কেমন করে?'

'কেমন করে আবার! খবরের কাগজে ছবি দেখে।'

'রিয়েলি?'

'তবে কি ঠাট্টা করছি?'

আরো কি যেন বলে দুজনেই। তারপর মণিকা বলল, 'ডক্টর আপনার খুব প্রশংসা করে চিঠি লিখেছেন।'

'প্রশংসা করার মতো তো কিছু করিনি।'

'আমি কি করে জানব বলুন? তবে অনুমতি দিলে ওর চিঠিটার রেলিভ্যান্ট পোর্সান পড়ে শোনাতে পারি।'

'ইফ ইউ উইস।'

মণিকা পড়ল, 'প্লিজ কনভে মাই পার্সোন্যাল থ্যাঙ্কস টু দ্যাট চার্মিং ইয়ং এ-ডি-সি টু দি গভর্নর। এমন একদিন আসবে যেদিন হয়তো গভর্নরকে ভুলে যাব কিন্তু ক্যাপ্টেন রায়কে নিশ্চয়ই ভুলব না।'

মণিকার কাছে এসব শুনতে খুব ভালো লাগে। হাসতে হাসতে বললেন, 'মাই গড। হোয়াট হ্যাভ আই ডান?'

মণিকাও একটু হাসতে হাসতে বলল, 'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

'এ চিঠি গভর্নরের হাতে পড়লে এক্ষুনি আমাকে বিদায় করবেন।'

ক্যাপ্টেন একটু হেসে আবার জানতে চায়, 'আর কি লিখলেন?'

'এর বেশি জানতে হলে এখানে এসে দেখে যান।'

অপ্রত্যক্ষ আমন্ত্রণ জানায় মণিকা।

'ডিনারের সময় বেড়াতে যাওয়া কি ঠিক হবে?' ঠাট্টা করেন এ-ডি-সি।

'সারা দুনিয়াটাকেই রাজভবন ভাবেন কেন বলুন তো?'

সেইদিন সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন রায় দ্বিতীয়বার পদার্পণ করলেন ডক্টর ব্যানার্জির বাড়িতে।

মণিকা দরজার গোড়ায় অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে বলল, 'আপনার মতো বলব নাকি প্লিজ কাম ইন?'

ক্যাপ্টেন হাসতে হাসতে বলেন, 'অতিথিকে অপমান করছেন?'

দাঁত দিয়ে জিভ কেটে মণিকা বলে, 'ছি, ছি। অপমান করব কেন? আসুন আসুন ভিতরে আসুন।'

মণিকার মা ভিতরের বারান্দা থেকে ড্রইংরুমে ঢুকেই বললেন, 'এসো, এসো। এতদিন পরে মনে পড়ল?'

মিসেস ব্যানার্জির কথায় খুশি হয় ক্যাপ্টেন। 'না, না, ওকথা কেন বলছেন? একটু ব্যস্ত ছিলাম কদিন।'

'বসো, বসো, কোনো তাড়াহুড়ো নেই তো? একেবারে খাওয়া-দাওয়া করে যাবে।'

ক্যাপ্টেনের জবাব দেবার আগেই মিস ব্যানার্জি বলে, 'সে কি মা? উইদাউট প্রপার ইনভিটেশন এ-ডি-সি কি ডিনার খেতে পারেন?'

ভদ্রমহিলা মেয়েকে শাসন করেন, 'আঃ! বুলু কি হচ্ছে?'

মণিকা যখন ছোট্ট ছিল তখন বুলবুলি পাখির মতো দিনরাত্তির বক বক করত। সেই থেকেই ওর নাম হয় বুলু। ছোট্ট মেয়েকে বুলু বলে ডাকলে হয়তো ভালোই লাগে কিন্তু তাই বলে এম-এ পাশ করার পরও বুলু?

'আঃ! মা, সবার সামনে কি বুলু বুলু করছ!'

এবার আর ক্যাপ্টেন চুপ করে থাকে না 'এত রাগ করছেন কেন? বুলু নামটা তো ভারি সুন্দর।'

'পরের ডাকমান শুনতে সবারই ভালো লাগে।'

মিসেস ব্যানার্জি যেন অনুযোগ করেন, 'আজকালকার কি যে ফ্যাশান তা বুঝি না। ডাকনাম ধরে ডাকলেই রেগে যায়।'

ক্যাপ্টেনের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'না মাসিমা। আমি কিন্তু রাগ করি না।'

মণিকা বলে, 'আপনি তো ডেঞ্জারাস লোক। বুড়ো-বুড়িদের খুশি করার বেশ কায়দা জানেন তো?'

মিসেস ব্যানার্জি ভিতরে যাবার সময় বলে গেলেন, 'তুমি ওর কথা গ্রাহ্য করো না।'

মিসেস ব্যানার্জি চলে যাবার পর মণিকা বলল, 'তারপর বলুন কেমন আছেন।'

'আপনি কেমন আছেন?'

'বেকারের আবার ভালো-মন্দ থাকার কি আছে?'

'আপনার চাকরি করার প্রয়োজন কি?'

'তাই বলে সারাজীবন বাপ-মার অন্ন ধ্বংস করব?'

'সারা জীবন কেন করবেন? লেখাপড়া শিখেছেন, এবার বিয়ে করে...'

ক্যাপ্টেনকে আর বলতে দেয় না মণিকা, 'বুড়ো লাটসাহেবের সঙ্গে থেকে বুড়োদের মতো কথাবার্তা চিন্তা-ভাবনা করতে শিখেছেন তো বেশ।'

'বিয়ের কথা বললেই বুড়োদের মতো হলাম?'

'তবে কি?'

চাকরটা এক কাপ কফি নিয়ে আসতে না আসতেই মিসেস ব্যানার্জিও ড্রইংরুমে এলেন। 'এখন আর কিছু দিলাম না। একটু পরেই খেতে দেব।'

ক্যাপ্টেন হাসিমুখে বলে, 'ঠিক আছে মাসিমা।'

এবার মণিকার দিকে ফিরে বলেন 'ডক্টর মঙের চিঠিটা কই?'

'চিঠিটা সত্যিই পড়বেন? পড়লে কিন্তু আপনার অহংকার বেড়ে যাবে।' বাঁকা চোখে হাসতে হাসতে মণিকা বলল!

'আপনি বড্ড বেশি তর্ক করেন।'

মণিকা হাসতে হাসতেই উঠে গেল।

একটু পরেই ডক্টর মঙের চিঠিটা নিয়ে এল, 'এই নিন, পড়ুন।'

'আপনিই পড়ুন।'

'না, না, আপনিই পড়ুন।'

'ওটা আপনার চিঠি। আমার পড়া ঠিক নয়।'

শেষ পর্যন্ত মণিকাই পড়ল, 'মাই সুইট লিটল মাদার, বেনারস আর গয়াতে এত বেশি পোগ্রাম ছিল যে কিছুতেই তোমাকে চিঠি লিখতে পারিনি। তাই তোমার বাবাকে শুধু একটা টেলিগ্রাম করি। যাই হোক সব সময় তোমাদের কথা মনে হয়। তোমার বাবা, মা ও তুমি আমাকে এত বেশি প্রাণের মধ্যে টেনে নিয়েছ যে একমুহূর্তও তোমাদের ভুলতে পারি না। বার বার মনে হচ্ছে আবার কবে রেঙ্গুন ফেরার পথে কলকাতা আসব...'

এবার মণিকা থামে। বলে, 'এবার আসল জায়গাটা পড়ি।'

'অ্যাজ ইউ প্লিজ।'

'তবে শুনুন।' মণিকা আবার শুরু করে, 'ক্যাপ্টেন রায়ের কি খবর? তোমার সঙ্গে এর মধ্যে দেখা হয়েছে নাকি ছেলেটিকে বড় ভালো লেগেছে। চেহারাটির মধ্যেই কেমন যেন একটা সুন্দর আকর্ষণ আছে...'

মণিকা মুখ টিপে হাসতে হাসতে জোর করে একটি কাশির আওয়াজ করল। একবার এক ঝলক দেখেও নেয় ক্যাপ্টেনকে।

'আরো পড়ব?'

ক্যাপ্টেনও চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলল, 'অ্যাজ ইউ প্লিজ!'

'আমি কিন্তু আপনার গভর্নর নই? কথায় কথায় এত প্লিজ প্লিজ না করলেও চলবে।'

'ইউ আর মাচ মোর ইমপর্ট্যান্ট দ্যান মাই গভর্নর।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

বসন্তের একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন এবার জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার বাবাকে দেখছি না?'

'বাবা কটকে গিয়েছেন।'

'কটকে?'

'হ্যাঁ। কটক ইউনিভার্সিটিতে একটা মিটিং আছে। বাবা থাকলে কি আমাকে বকবক করতে হতো?'

'কেন, আপনার বাবা বুঝি কথাবার্তা বলতে খুব পছন্দ করেন?'

'সারাজীবন প্রফেসারি করে কাটিয়েছেন। ছেলেমেয়ে দেখলেই বক্তৃতা না দিয়ে থাকতে পারেন না।'

মিসেস ব্যানার্জি আবার ড্রইংরুমে এলেন, 'কিরে বুলু, ছেলেটাকে খেতেটেতে দিবি নাকি শুধুই বকবক করবি?'

খাওয়া-দাওয়ার পর্বটা বেশ ভালোই হল। বহুদিন পর কেন, বহু বছর পর এমন খাওয়া হল।

বাংলাদেশের বাঙালিদের খাওয়া-দাওয়ার একটা ধরন আছে। হরেক রকম ডাল, তরকারি, মাছ। তার সঙ্গে দই, মিষ্টি। মাঝে চাটনি। প্রবাসী বাঙালিরা আধিক্য বর্জন করেন কিন্তু ঠিক বাঙালিপনা ছাড়তে পারেন না। ডাল থাকে, মাছ থাকে ; বাদ পড়ে তরকারি। তার বদলে হয়তো বা মাংস। চাটনি থাকলেও একটু আচার, স্যালাড, ফ্রাই, সসের মতো কিছু পাওয়া যাবে। এর ব্যতিক্রম হয় দেশ, কাল ভেদে। দক্ষিণ দেশের বাঙালিগৃহে সম্বার, চন্ডীগড়ে বাঙালিগৃহে বেসনের কাড়ি পাওয়া যায়।

যেসব বাঙালিরা দেশ-বিদেশে ঘুরে বাংলাদেশেই ফিরে আসেন, খাওয়া-দাওয়াটা তাদের ঘরেই ভালো হয়। নানারকম খাবারের আদিতে একটু সুপ, অন্তে একটু পুডিং ও এক কাপ কফিও থাকে।

আর্মি মেসে আর রাজভবনে খেয়ে খেয়ে মা-র হাতের রান্নার কথা ভুলেই গেছে ক্যাপ্টেন। আজ মনে পড়ল মা-র রান্নার কথা।

ক্যাপ্টেনকে খাইয়ে মিসেস ব্যানার্জি খুব খুশি। 'কষ্ট করে রান্না-বান্না করার পর অশ্রদ্ধা করে খেলে বড় বিরক্ত লাগে।'

'আমি কিন্তু অশ্রদ্ধা করে খাইনি, মাসিমা।'

'না বাবা। আমি তো তা বলছি না।'

একটু যেন আপন মনে হয় ক্যাপ্টেনকে।

দৃষ্টিটা মণিকার দিকে ঘুরিয়ে বলেন, 'ওর বাবা বেশ খাওয়া-দাওয়া পছন্দ করতেন! এখন অবশ্য কিছুই খেতে পারেন না। কিন্তু এই হতভাগী মেয়েটা কিছু খায় না।'

আবার একটু থামলেন। 'লোকে না খেলে কি রান্না-বান্না করতে ভালো লাগে?'

'মাসিমা, ওটা আজকালকার মেয়েদের ফ্যাশান।'

এতক্ষণ মণিকা চুপ করেছিল। 'মা-র মোসাহেবী করছেন কেন বলুন তো?'

ক্যাপ্টেন মজা করে, 'হোয়াট?'

হাসিটা চেপে থাকলেও ইরানি ঠোঁটের কোণায় যে সামান্য ইঙ্গিতটুকু ছিল, তাতেই মণিকার সারা মুখে মিহি আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। 'আর হোয়াট, হোয়াট করবেন না। লাটসাহেবের মোসাহেবী করে করে মোসাহেবী করাটা অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'আঃ! বুলু কি যা তা বলছিস?'

দিন কতক পরে যখন মণিকার সঙ্গে দেখা হল তখন ক্যাপ্টেন বলেছিল, 'আপনি এখনও সেই ছোট্ট বুলবুলিই থেকে গেছেন।'

'কেন বলুন তো?'

ক্যাপ্টেন হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল, 'এখনও বেশ মিছিমিছি সুন্দর কথা বলতে পারেন।'

সেই সুন্দর ইরানি ঠোঁটটা উল্টেই বলেছিল, 'পঁচিশ বছরের বুড়ির আবার মিছিমিছি কথা?'

'আপনি বুড়ি?'

'তবে কি? জানেন না বাঙালি মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি হয়?'

'ইউ উইল নেভার বি বুড়ি।'

মণিকা ভুলতে পারেনি কথাটা। ঘরে, বাইরে, সর্বত্র প্রতিধ্বনি হয়ে কানে ভেসে আসছিল। 'ইউ উইল নেভার বি বুড়ি', 'ইউ উইল নেভার বি বুড়ি!'

ক্যাপ্টেনের দৃষ্টিটা যে ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে, তা বুঝতে কষ্ট হল না মণিকার। ভালোই লাগল।

কথাটা তো ভালো লেগেছিল। এমন দৃষ্টি নিয়ে আগে কি কেউ দেখেছে? মণিকার মনে পড়ে না। জাল ফেললেই পুকুরের সব মাছ ধরা পড়ে না, পড়তে পারে না। ফসকে যায়, পালিয়ে যায়। কলেজ ইউনিভার্সিটির জীবনে মণিকাও ধরা পড়েনি। কিন্তু আজ?

মনের মধ্যে এই এখন দোলা লাগল। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সঙ্কোচ যেন এই এখন অনুভব করল মনে মনে।

কটক থেকে ডক্টর ব্যানার্জি ফিরে এলেন কদিন পর।

'ওগো, ওই এ-ডি-সি ছেলেটিকে একদিন খেতে বলেছিলাম...'

'তাই নাকি?'

'বেশ ছেলেটি।'

'হ্যাঁ আমারও বেশ লেগেছে।' ডক্টর ব্যানার্জি হাতের বইটা নামিয়ে রেখে বলেন, 'নিশ্চয়ই ভালো ফ্যামিলির ছেলে।'

ক্যাপ্টেন রায়ের পরিবারের কোনো খবরই জানেন না মিসেস ব্যানার্জি। তবুও বললেন, 'তাতো বটেই।'

হাসতে হাসতে ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, 'গভর্নরের চাইতে এ-ডি-সি-কেই তো প্রফেসার মণ্ডের বেশি ভালো লেগেছে'।

'উনি ঠিকই বলেছেন।'

পরে ডক্টর ব্যানার্জি মণিকাকে বলেছিলেন, 'হাঁরে বুলু, আমি যখন ছিলাম না, তখনই তোর মা ওই এ-ডি-সি ছেলেটিকে খেতে বলল?'

মণিকা শুধু একটু হাসল। কিছু বলল না।

'আর একদিন ওকে আসতে বলিস।'

'মা-কে বলো। মা-র সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে।'

ডক্টর ব্যানার্জির মজা লাগে নিজের স্ত্রীর কথা শুনতে। 'তোর মা-র ব্যাপারই আলাদা।'

'এ-ডি-সি তো বেশ চালাক আছে। মাসিমা–মাসিমা করে বেশ জমিয়েছে।'

'প্রথম দিনই যখন মাসিমা বলেছে তখন তো তোর মা গলে গেছে।'

আর্মি লাইফে একটা উত্তেজনা আছে। কাজকর্মের মাঝে অবকাশ থাকলেও অবসর নেই। কখনো নিজেকে নিয়ে, কখনো পরকে নিয়ে। কখনও বা সবাইকে নিয়ে। পরিচিত, অপরিচিত, আধা পরিচিতদের নিয়ে। কোথাও ব্যারাকে, কোথাও মেসে, কোথাও কোয়ার্টারে থেকেছে। একা একা। তবে নিঃসঙ্গ হয়নি কোনোদিন। আর্মি বা এয়ারফোর্সে কেউ নিঃসঙ্গ নয়। ওরা খায়-দায়-ঘুমোয় একসঙ্গে। নাচ-গান মদ খায় একসঙ্গে। যুদ্ধ করে একসঙ্গে। মৃত্যুর সময়ও ওরা নিঃসঙ্গ নয়। দল বেঁধে মরে ওরা।

রাজভবনে আসার পরই সুরটা পাল্টে গেল। এখানে নিজের নিজের তালে সবাই মত্ত। যারা দল বেঁধে মরতে শিখেছে, তাঁরা যেন এখানে বেমানান। এরা এক টুকরো রুটি কাউকে দিতে পারে না, নিজেরা কেক্ খেতে ওস্তাদ!

এতদিনের অভ্যাস, এতদিনের ট্রেনিং ভুলতে পারেননি। ধীরে ধীরে বহু দূরে সরে গিয়েছিলেন। পাশাপাশি কাজ করেছেন কিন্তু কাছাকাছি আসতে পারেননি। মতের মিল হয়নি।

আমজাদ-রমজানের সঙ্গে গল্প করেছেন। ডায়ানা-ডরোথির গল্প শুনেছেন। পুরনো দিনের গভর্নমেন্ট হাউসের কাহিনি শুনেছেন, অফিসারদের নোংরামি জেনেছেন। তাদের নিয়ে সময় কেটেছে। ব্যস, তার বেশি কিছু নয়। লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে গেলে সতীনাথের অতৃপ্ত আত্মার ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আশেপাশেই কোথাও মিস বিশ্বাসকে দেখতে পায়।

সময় কাটে আরো নানা ভাবে। সভা-সমিতিতে, পার্টি রিসেপশনে ককটেলে। তবুও ক্যাপ্টেন নিঃসঙ্গ থেকে যায়।

সেদিন রাত্রে নেমন্তন্ন খেয়ে আসার পর অনেকবার টেলিফোন করতে ইচ্ছা করেছে, আগ্রহ হয়েছে। তবুও করেননি। লজ্জা, সংকোচ আর কিছু আত্মসম্মানবোধ বাধা দিয়েছে।

আর দেরি করলেন না। হাজার হোক একটা ধন্যবাদ জানানো কর্তব্য। 'বেটার লেট দ্যান নেভার।'

'আমি ক্যাপ্টেন রায় বলছি।'

ডক্টর ব্যানার্জি প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন। টেলিফোনের ঘণ্টা শুনে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন।

'কেমন আছ?

'ভাল। আপনি ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ, এর মধ্যে এসো। আমি একটু বেরুচ্ছি। তুমি কথা বলো।'

ডক্টর ব্যানার্জি চলে গেলেন।

মণিকা ভেবেছিল কোনো পুরনো ছাত্র হবে।

'আমি মণিকা বলছি।'

'আমি ক্যাপ্টেন রায়।'

হঠাৎ এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে পড়ল মণিকার মুখে। 'আপনি! এতদিন পর মনে পড়ল?'

'আপনার বুঝি রোজ মনে পড়ত?'

মনে পড়ত বৈকি! কিন্তু সে কথা কি বলা যায়? স্বীকার করা যায়?

'আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের কথা বাদ দিন।'

'আপনিও তো একবার টেলিফোন করতে পারতেন।'

'একবার কেন, একশো বার করতে পারি, কিন্তু আপনাকে কি পাওয়া যাবে?'

'আপনার জন্য, আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস।'

মজা করে মণিকা। 'সিরিয়াসলি? নাকি রাজভবনের প্রোটোকলের মতো কথা বলছেন?'

'বুড়ো গভর্নরের চাইতে আপনাদের সান্নিধ্য নিশ্চয়ই মোর ইন্টারেস্টিং।'

ক্যাপ্টেন যে বলতে চাইছিল ওরই সান্নিধ্যে মোর ইন্টারেস্টিং, তা বঝুতে কষ্ট হল না মণিকার। হাজার হোক পঁচিশটি বসন্ত-মল্লিকার সৌরভে ভরেছে দেহ মন। তাই তো 'বারতা পেয়েছি মনে মনে সব নিঃশ্বাস পরশনে' কিন্তু বলতে পারে না 'কেন বঞ্চনা কর মোরে, কেন বাঁধ অদৃশ্য ডোরে—দেখা দাও দেখা দাও দেহ মন ভরে মম নিকুঞ্জবনে।'

বলতে পারে না অনেক কথাই। কিন্তু মন? মুখে শুধু বলল, 'সেইজন্যই তো এতদিন পর টেলিফোন করছেন।' একটু থেমে আবার বলল, 'বাবা বলছিলেন আপনি যদি একদিন আসতেন...'

'শুধু আপনার বাবাই বলছিলেন?'

'মা তো চান আপনি রোজই আসুন।'

'তাই নাকি? এনিবডি এলস্?'

মণিকার মুখে একটু হাসির রেখো ফুটে ওঠে। 'এই কিছুদিন রাজভবনে থেকেই তো বেশ পলিটিক্স শিখেছেন।'

'কেন বলুন তো?'

এসব কথার অর্থ নেই, তাৎপর্য শুধু মনে মনে। রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে হাস্নাহানা, ছড়িয়ে পড়ে তার সৌরভ।

শেষে ক্যাপ্টেন বলে, 'আমি তবুও একবার ঘুরে এসেছি। এবার তো আপনার একবার আসা উচিত।'

'আসব বৈকি। আপনি এর মধ্যে একবার আসুন। তারপর নিশ্চয়ই যাব।'

'ঠিক তো?"

'নিশ্চয়ই।'

বিন্দু বিন্দু শিশির ঝরে পড়ে রাতের অন্ধকারে। তার স্পর্শে, ভালোবাসায় ধীরে ধীরে জন্ম নেয় ফুল। রাতে অন্ধকারে এ খেলা দেখা যায় না, বোঝা যায় না, অনুভব করাও যায় না। কিন্তু ভোরেব আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে ফুলের মেলা।

ক্যাপ্টেন আর মণিকাও বুঝতে পারেনি। যেমন 'রজনী স্বপনে ভরে সৌরভে, তুমি জান নাই, তুমি জান নাই, মরমে আমার ঢেলেছে তোমার গান।' কোথায় লুকিয়ে ছিল এই মন? চোখের এই দীপ্তি? আঁখি-পল্লবে এই মায়াকাজল?

ডক্টর ব্যানার্জি বড় খুশি হলেন ক্যাপ্টেনকে দেখে। 'তোমার প্রেজেন্ট অ্যাসাইনমেন্টটা তো খুব ইন্টারেস্টিং?'

হাসতে হাসতে ক্যাপ্টেন বলল, 'হ্যাঁ, তা কিছুটা।'

'তোমরা বুঝি এলাহাবাদের বাসিন্দা?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন এলাহাবাদে আছ?'

'বাবা ল পাশ করার পরই এলাহাবাদ যান। সেই থেকেই...'

'তোমার বাবা এখনও প্র্যাকটিশ করেছেন?'

'বছর দুই হল এলাহাবাদ হাইকোর্টের জর্জ হয়েছেন বলে...'

ডক্টর ব্যানার্জি খুশি হয়ে বলেন, 'আই সি!'

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিসেস ব্যানার্জি। বলেন, 'তোমার আর ভাইবোনেরা এলাহাবাদেই?'

ক্যাপ্টেন মজা করে বলে, 'সেদিন খাওয়া-দাওয়া দেখে বুঝতে পারেননি আমিই বাড়ির একমাত্র ছেলে?'

ইতিমধ্যে ডক্টর ব্যানার্জির এক পাবলিশার্স এসে হাজির হলেন এক বান্ডিল প্রুফ আর কিছু

কাগজপত্তর নিয়ে।

মিসেস ব্যানার্জি ক্যাপ্টেনকে নিয়ে মণিকার ঘরে বসিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরেই দীর্ঘ বিনুনির শেষে বাঁধুনী দিতে দিতে মণিকা এলো।

'এইভাবে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে আর কতদিন নেগলেকট্ করবেন?'

বিনুনি বাঁধা শেষ হল। বুকের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল যে বিনুনি তাকে ছুঁড়ে দিল পিছন দিকে। ঈষৎ বাঁকা চাহনি আর চোরা হাসি হাসতে হাসতে মণিকা বলে, 'তার মানে?'

'আপনি আসতে বললেন আর আপনারই পাত্তা নেই?'

'স্নান করতে গিয়েছিলাম। বিকেলে এক পুরনো বন্ধু আর তার স্বামী এসেছিলেন বলে গল্প করতে করতে দেরি হয়ে গেল।'

'ভালই হয়েছে।'

'কেন বলুন তো?'

'ইউ লুক ভেরি ফ্রেশ।'

আরো অনেক কিছু বলতে ইচ্ছা করছিল ক্যাপ্টেনের। মন বলছিল, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা মম শূন্যগগনবিহারী।'

অথবা...

'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুম চয়নে।'

সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দু-খানি নয়নে।'

মনে মনে ভাবতে গিয়েও ঠোঁটটা বোধহয় একটু নড়েছিল, একটু কেঁপেছিল। মণিকার দৃষ্টি এড়ায়নি।

'কি বলছেন মনে মনে? গালাগালি দিচ্ছেন না তো?'

মনের কথাও জানতে পারে মণিকা? ক্যাপ্টেন চমকে ওঠে। 'কি করে বুঝলেন মনে মনে কিছু বলছি?'

'এটা মেয়েদের ট্রেড-সিক্রেট। বলতে নেই।'

'তাই নাকি?'

'তবে কি?'

মিসেস ব্যানার্জি ঘরে ঢুকেই একটা প্লেট এগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেনের দিকে।

'মাছ ভাজা দুটো খেয়ে নাও।'

'সে কি মাসিমা?'

'রান্নাবান্না কিছু হয়নি। আজ খেতে খেতে অনেক দেরি হবে!'

'মা-মাসির কাছে এলে না খেয়ে কে যায়?' মিসেস ব্যানার্জি আর কথা না বলে ভিতরে চলে গেলেন।

মণিকা তখনও দাঁড়িয়ে।

ক্যাপ্টেন জানতে চাইল, 'বসবেন না?'

মণিকা পাশের বুক শেলফ্-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'সারাদিন শুয়ে-বসে তো টায়ার্ড হয়ে গেলাম। আপনার মতো মুক্ত বিহঙ্গ হলে তো বেঁচে যেতাম।'

'এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা।'

ভ্রু কুঁচকে বাঁকা চোখে মণিকা ঠোঁটের কোণে একটু হাসি আটকে রেখে জানতে চাইল, 'একটা কথা বলবেন?'

'আপনাকে না বলার মতো তো কিছু নেই।'

'এত কাব্য সাহিত্য চর্চা করলেন কোথায়?'

'আমার কর্মজীবনে কাব্য-সাহিত্যের স্থান নেই বলেই অবসর কাটাই কাব্য পড়ে।'

ক্যাপ্টেন একটু থামে। মুখটা উঁচু করে মণিকার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তাছাড়া অবসর যে প্রচুর! একটু গল্প করে সময় কাটাবার মতো কেউ নেই আমার। গত্যন্তর নেই বলেই শুয়ে শুয়ে বই পড়ি।'

'আমাদের এখানে চলে এলেই তো পারেন।'

'আপনিও তো আসতে পারেন আমার ওখানে।'

'কোনোদিন তো বলেননি।'

'সব কথাই কি বলতে হয়?'

তা বটে। 'আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে, তোমার ভাবনা তারার মতো বাজে।' মণিকা বোঝে বৈকি।

'সত্যি, আমার যাওয়া উচিত ছিল।'

মণিকা গিয়েছিল। টেলিফোন করে ক্যাপ্টেনের ছুটির দিনে গিয়েছিল।

নর্থ গেট পুলিশ অফিস থেকে টেলিফোন পাবার পরই ওই পায়জামা পাঞ্জাবি পরেই ক্যাপ্টেন গিয়েছিল পোর্টিকোতে মণিকাকে অভ্যর্থনা জানাতে।

ইউনিফর্ম বা স্যুট পরতেই দেখেছে এর আগে। নতুন বেশে বেশ লাগল। লিফট্-এর ওখানে পৌঁছে ক্যাপ্টেন বাটন্ পুশ করল। পাশে দাঁড়িয়ে মণিকা এক ঝলক দেখে নিয়ে বলল, 'আজ এই পোশাকে তো বেশ লাগছে!'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'আবার থ্যাঙ্ক ইউ বলছেন? অমন করে প্লিজ আর থ্যাঙ্ক করলে এক্ষুনি চলে যাব।'

এর মধ্যে লিফ্‌ট নেমে এলো। মুখের ঝগড়া চোখের হাসিতে মিটমাট হয়ে গেল। তবে নিজের ঘরে ঢুকেই ক্যাপ্টেন বলল, 'বার্মিজ মেয়েদের মতো আপনি একটু শাসন করতে পছন্দ করেন, তাই না?'

'শুধু বার্মিজ মেয়েরাই নয়, সব দেশের মেয়েরাই পুরুষদের উপর খবরদারি করতে পছন্দ করে। আমিও পছন্দ করি!'

'থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর ফ্র্যাঙ্কনেস্।'

মণিকা বসেছে। ক্যাপ্টেন তখনও দাঁড়িয়ে।

'বসুন।'

'বসছি।'

'নাকি ভাবছেন সিরাজদৌল্লার ওই পরাজিত সৈনিকদের ডেকে কাটলেট-ওমলেট চা-কফির অর্ডার দিতে হবে?'

মণিকার কথায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন না হেসে পারে না।

মণিকা আবার বলে, 'আচ্ছা এখানকার খাবার-দাবার খেতে আপনার ভালো লাগে?'

'ভালো লাগলেই কি সবকিছু পাওয়া যায়? নাকি, খারাপ লাগলেই দূরে রাখা যায়?'

মণিকা কথাটা ঘুরিয়ে দেয়, 'এখানকার কাটলারিজ ক্রকারিজ দেখলেই কি মনে হয় জানেন?'

'কি?'

'মনে হয় সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁতিয়া তোপি, ঝাঁসির রানির প্যালেস লুঠ করে এসব

জোগাড় করা হয়েছিল। আর কিছু এসেছিল উইন্ডসর ক্যাসেল-এর পুরনো স্টোর রুম থেকে।'

দু'জনে হাসে। হাসতে হাসতে ক্যাপ্টেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মণিকার দিকে। বেশ লাগে মণিকাকে। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যাবার পর হঠাৎ লজ্জা লাগে।

দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, বসুন।

এবার ক্যাপ্টেন বসে। একই কৌচের অপর কোণায়।

সেন্টার টেবিল থেকে সিগারেট-কেস খুলে একটা সিগারেট তুলে নেয়। মণিকা সঙ্গে সঙ্গে তুলে নেয় লাইটার। জ্বালিয়ে ধরে ক্যাপ্টেনের সামনে। সে একটা টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'ধন্যবাদ জানাব?'

'প্রয়োজন নেই!'

আরো দু-একবার সিগারেট টান দিয়ে ক্যাপ্টেন বলে, 'চা আনতে বলি?'

নাক উঁচু করে, ঠোঁটটা উল্টে মণিকা বলল, 'চা? এখানে নয়, চলুন বাইরে খাব।'

'চলনু' বলেই ক্যাপ্টেন উঠে পড়ল। ঘরের কোণায় ওয়াড্রোব খুলে একটা লাইট কালারের স্যুট বের করে বাথরুমের দিকে এগুতে গেলেই মণিকা বলল, ছুটির দিনেও স্যুট পরবেন?'

'তবে কি পরব?'

'কেন, আপনার ধুতি নেই?'

'সরি! একটাও ধুতি নেই।'

'সে কি? বাঙালির ছেলে অথচ একটাও ধুতি নেই?'

'বাঙালিপনা দেখাবার সুযোগ পেলাম কোথায় বলুন?'

একটু থেমে ক্যাপ্টেন জানতে চায়, 'কেন, স্যুট পরলে কি দেখতে খারাপ লাগে?'

'না, না, তা তো বলিনি। তবে বাঙালির ছেলেরা মাঝে মাঝে ধুতি-পাঞ্জাবি পরবে বৈকি।'

'ধুতি না পরার জন্য মার কাছেও কি কম বকাবকি শুনি?'

'এবার আরো শুনবেন।'

'তা তো বুঝতেই পারছি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্যাপ্টেন স্যুট-টাই পরে বেরিয়ে এলো।

'বেশি দেরি করি নি তো?'

'বার্মিজ মেয়েরা আরো অল্প সময় নেয়।' নীচের ঠোঁটটা ডান দিকে টেনে চাপা হাসি মুখে এনে মণিকা বলল।

'ভগবান সবাইকে তো আপনার মতো রূপ দিয়ে পাঠান না।'

যেমন বোলিং তেমনি ব্যাটিং। তাছাড়া ক্রিজটাও বোধকরি ভালো ছিল। অপরাহ্নের ক্লান্ত সূর্য রাজভবনের চারপাশের পাম গাছের মধ্য দিয়ে উঁকি দিতে দিতে গোধূলির আলাপ শুরু করে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে দুটো একটা কোকিলের ডাকও ভেসে আসছিল।

ভাল লাগারই তো সময়।

'আমাকে কী খুব রূপসী মনে করেন?'

'খুব বেশি রূপসী হলে আপনার সঙ্গে মেলামেশাই করতাম না।'

অবাক হয় মণিকা। 'তার মানে?'

'বেশি সুন্দরীদের দিয়ে কোনো কাজ হয় নাকি?'

'অনেক সুন্দরীর সঙ্গে মিশেই কী এই অভিজ্ঞতা?' জেরা করে মণিকা।

হাসতে হাসতে ক্যাপ্টেন বলে, 'Remember that the most beautiful things in the

world are the most uselesspeacocks and Lilies for example.'

আপন মনেই মণিকা বলে, 'শুধু রাশকিন্ পড়েই কি এই অভিজ্ঞতা হয়?'

'নিশ্চয়ই...' অত্যন্ত মার্জিতভাবে হাসতে হাসতে ঠাট্টা করলেও অন্য মেয়ের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের ঘনিষ্ঠতার সামান্যতম ইঙ্গিত মণিকাকে ঈর্ষান্বিত করে। মজা লাগে ক্যাপ্টেনের।

'তর্ক করবেন না বেরুবেন?'

'তর্ক করছি?'

'তর্ক করছেন না?'

'তাই বলে আপনি আমাকে যা তা বলবেন?'

'সুন্দরকে সুন্দর, ভালোকে ভালো বলব না?'

ক্যাপ্টেন কি করে বোঝায় মণিকাকে? একথা কি বলা যায় যে 'The beauty shall no more be found' অথবা 'চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে।' নবাব সিরাজদৌল্লার মতো কৈশোরের প্রারম্ভ থেকেই নারী-সাহচর্য উপভোগ করেনি ক্যাপ্টেন কমল রায় কিন্তু মেলামেশা তো করেছে বহুজনের সঙ্গে। এ-ডি-সি হয়ে কলকাতায় আসার পরই কি কম মেয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল? গ্র্যান্ড--গ্রেটইস্টার্ন--স্পেনসেস, ক্যালকাটা ক্লাবে বা কোচবিহার কাপের খেলার দিন টার্ফ ক্লাবে গেলে কত ললিত-লাবণ্যের দেখা হয়। কথা হয়, হাসি হয়, ঠাট্টা-মস্করা হয় কিন্তু তারা তো, 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায়' না। বাগানে কত ফুল ফুটে থাকে ; যাদের ফ্লাওয়ার ভাস-এ রাখলে ভালো লাগে তাদের দিয়ে কি পুজোর অঞ্জলি দেওয়া যায়?

ক্যাপ্টেনের মনের এসব কথা কি কোনো ভাষায় ব্যক্ত করা যায়?

একটু পরে ক্যাপ্টেন আবার বলে, 'আজ আর আপনার সঙ্গে তর্ক করব না।'

ঘাড় বেঁকিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে মণিকা বলে, 'কেন?'

'তর্ক করলে কি গান শোনাবেন?'

মাথাটা দোলাতে দোলাতে মণিকা বলে, 'বিশ্বাস করুন, আজকাল আর একেবারেই চর্চা করি না।'

'তাতে কি হয়েছে? আজ থেকেই না হয় আবার গানের চর্চা শুরু হবে।'

ঘরের এপাশে-ওপাশে ঘুরে-ঘুরে ক্যাপ্টেন সিগারেট, দেশলাই, পার্স ও আরো কি কি পকেটে পুরে নিল। লম্বা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে একবার চুলটা ব্রাশ করে নিল।

'চলুন, বেরিয়ে পড়ি।'

মণিকা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন।'

পাশাপাশি এগুতে গিয়েই একবার দু'জনে দু'জনকে দেখে নিল। মণিকা একটু লজ্জিত হল এমন করে চোখে চোখ পড়তে। চট করে বুদ্ধি খাটিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সবকিছু নিয়েছেন তো?'

ক্যাপ্টেন থমকে দাঁড়িয়ে পকেট হাতড়ে বলল, 'দ্যাট্স্ রাইট! ফোর্ট উইলিয়াম থেকে এক বন্ধুর গাড়ি নিয়ে এসেছি, কিন্তু চাবিটা নিতেই ভুলে গেছি।'

'তা না হলে পুরুষ মানুষ?'

'ভুলে গেলে মনে করিয়ে দেবার জন্য তো আপনারা আছেন।'

এ বহুবচনের অর্থ মণিকা বোঝে। মুখে কিছু বলে না, মনে মনে তৃপ্তি পায়।

রাজভবনের নর্থ-ইস্ট গেটের পাশে গাড়িটা একটা গাছের ছায়ায় ছিল। দরজার লক্ খুলে

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করল, কোথায় বসবেন? সামনে না পিছনে?'

পিছনে বসলে লোকে যে আপনাকে ড্রাইভার ভাববে।' হাসতে হাসতে মন্তব্য করে মণিকা।

ক্যাপ্টেন চুপ করে থাকে না। 'সামনে বসলে যে লোকে আপনাকে আমার স্টেনোগ্রাফার ভাববে?'

'আমাকে দেখে কেউ স্টেনো ভাববে না।'

'এটা যে অফিস এরিয়া।'

'তবুও।'

'তবে কি ভাববে?'

বিপদে পড়ে মণিকা। 'যা ইচ্ছে ভাবে ভাবুক।'

ক্যাপ্টেনের পাশে বসে মণিকা।

এবার গাড়িতে স্টার্ট করে ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করে, 'বলুন, কোথায় যাবেন?' প্রস্তাব, পালটা প্রস্তাবের পর মণিকা বলল, 'চলুন, মধ্যমগ্রাম ঘুরে আসি।'

'সেখানে কি আছে?'

'আমাদের একটা ছোট্ট ফার্ম আছে।'

ক্যাপ্টেনের মনে পড়ল মণিকার মা-ই একদিন বলেছিলেন, নিজেদের বাগানের শাক-সবজি কত কি আসে, কিন্তু খাবার লোক নেই।

ক্যাপ্টেন জানতে চেয়েছিল, 'কোথায় আপনাদের ফার্ম?'

'মধ্যমগ্রাম। একবার দেখে এসো, ভালো লাগবে। দু-এক বছর পর উনি তো ওখানেই থাকবেন বলেছেন।'

স্টিয়ারিংটা ভালো করে ধরে গিয়ার দিতে দিতে মণিকাকে বলল, 'ঠিক আছে বাট-লেট্ আস হ্যাভ সাম টি বিফোর দ্যাট।'

'চলুন। আপনারা হোটেল-রেস্তোরাঁয় না গেলে ঠিক শান্তি পান না, তাই না?'

ক্যাপ্টেন হাসে। বলে, 'যারা নিজের ঘর বাঁধতে পারেনি, তাদের আর কি গতি বলুন? মধ্যমগ্রামে গেলে চা খাওয়াবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে চলুন।'

সোজা মধ্যমগ্রাম গিয়েছিল। গাড়ি চালাতে চালাতে ক্যাপ্টেন বার বার এদিক-ওদিক কি যেন দেখছিল।

'কি দেখছেন?'

'এই লোকজন।'

'লোকজন?'

'হ্যাঁ। প্রবাসী বাঙালি বলে কোনোদিন এত বাঙালি ছেলে-মেয়ের ভিড় দেখিনি। তাই তো কলকাতার রাস্তাঘাটে এত বাঙালি দেখতে ভীষণ ভালো লাগে।'

'ক বছর রেঙ্গুনে কাটিয়ে কলকাতা ফেরার পর আমারও এমনি হয়েছিল।'

'বাংলাদেশের অ্যাটমস্‌ফিয়ার এনজয় করব বলে এ-ডি-সি-র চাকরি নিয়ে এলাম, কিন্তু ঠিক যেটা চেয়েছিলাম সেটাই পেলাম না।'

যতীন্দ্রমোহন এভিন্যু পিছনে ফেলে শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় পার হল।

মণিকা ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা রাজভবনের অ্যাটমস্‌ফিয়ারটা অমন

পিকিউলিয়ার কেন বলুন তো?'

'কেন তা জানি না। তবে একটা জগা-খিচুড়ি অ্যাটমস্‌ফিয়ার। খানিকটা কলোনিয়াল, খানিকটা বাদশাহী, খানিকটা ইংলিশ। সব কিছু পাবেন, পাবেন না ইন্ডিয়ান অ্যাটমস্‌ফিয়ার।'

'ঠিক বলেছেন।'

'কোটিপতি ইন্ডিয়ানদের বাড়িতেও একটা আবছা আবছা ভারতীয় পরিবেশ পাবেন, কিন্তু এখানে তাও নেই।'

'অনেকটা হোটেল-হোটেল অ্যাটমস্‌ফিয়ার।'

'না, তাও না। হোটেলে মানুষ স্বাধীনভাবে হাসে, খেলে, গান গায় কিন্তু রাজভবনে সে অ্যাটমস্‌ফিয়ারও নেই।'

'এমন পরিবেশের মধ্যে থাকতে কষ্ট হয় না?'

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে রাস্তার মোড় ঘুরে ক্যাপ্টেন হাসতে হাসতে তাকাল মণিকার দিকে। 'দারুণ কষ্ট হয়, কিন্তু কে আমাকে মুক্তি দেবে বলুন?'

মণিকা আস্তে মাথাটা নীচু করল। মুখে কিছু বলল না।

ফার্মে সময়টা বেশ কেটেছিল। গাড়ি থেকে মণিকাকে নামতে দেখেই বনমালী ছুটতে ছুটতে এসে বলল, 'কি দিদিমণি? কি ব্যাপার?'

বনমালী এক ঝলক ক্যাপ্টেনকেও দেখে নিল।

'কি আবার ব্যাপার? তোমাকে দেখতে আসব না?'

আনন্দে খুশিতে প্রায় লুটিয়ে পড়ল বৃদ্ধ বনমালী। 'তোমরা ছাড়া আমাকে আর কে দেখে বল?'

এবার মণিকা ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা যখন রাজশাহী কলেজে, তখন থেকে বনমালী আমাদের সঙ্গে আছে। আমি এরই কোলে চড়ে মানুষ হয়েছি।'

'ইজ ইট?'

'হ্যাঁ। বনমালী হচ্ছে বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারি।'

বনমালীর মুখে আবার সেই খুশির হাসি। 'কি যে বল দিদিমণি!'

একটু পরেই বলল, 'চল, চল ভিতরে যেয়ে বসবে চল।'

ফার্মের এক কোণায় ছোট্ট দুখানি ঘর। ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ক্যাপ্টেন বলল, বেশ বোঝা যায় কোনো অধ্যাপকের ঘর।'

বনমালী চেয়ার এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'তুমি আজ এসে ভালোই করেছ।'

'কেন?'

'কতকগুলো পেঁপে পেকে উঠেছে। আজকালের মধ্যে না খেলে নষ্ট হয়ে যাবে!'

আবার ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে চাইল মণিকা, 'জানেন বনমালী কোনোদিন নিজের সংসার করল না কিন্তু আমাদের সংসার নিয়েই ও পাগল!'

বনমালীর আদর-অভ্যর্থনার পর্ব শেষ হল। জিজ্ঞাসা করল, 'দিদিমণি, তোমরা কিছুক্ষণ আছ তো?'

'হ্যাঁ।'

আমি তাহলে একটু ওদিকে যাচ্ছি। যাবার আগে আমাকে ডাক দিও কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই!'

বনমালী চলে গেল। যতক্ষণ ওকে দেখা গেল, ক্যাপ্টেন ওর দিকেই চেয়ে রইল। তারপর মণিকার দিকে ফিরে বলল, 'এই যুগেও এমন বনমালী পাওয়া যায়?'

'সত্যি হি ইজ এ রেয়ার ক্যারেকটার! তাছাড়া আমাকে ভীষণ ভালোবাসে।'

ছোট্ট একটু মুচকি হাসি হেসে ক্যাপ্টেন বলে, 'আপনাকে দেখছি সবাই ভালোবাসে!'

'ঠাট্টা করছেন?' চোখের কোণে একটু বিদ্যুৎ হাসির ইঙ্গিত ফুটিয়ে মণিকা জানতে চায়।

'প্রফেসর মণ্ড থেকে শুরু করে বনমালী পর্যন্ত সবাই-ই আপনাকে ভালোবাসে।'

'আপনাকে যতটা উদার ভেবেছিলাম, এখন দেখছি তা নয়।'

'ইজ ইট?'

'তবে কি?'

মণিকা একটু হাসে, একটু চুপ করে। তারপর বলে, 'এখানে বসে বসে ঝগড়াই করবেন, নাকি একটু ঘুরে দেখবেন?'

মজা করে ক্যাপ্টেন, 'এখানে বসে বসে ঝগড়া করতে পারলেই বেশি খুশি হতাম, কিন্তু বনমালী হয়তো পছন্দ করবে না।'

ক্যাপ্টেন একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'চলুন একটু ঘুরেই আসি।'

'চলুন।'

বাগানটি খুব বড় না হলেও নেহাত ছোট নয়। দেশ-বিদেশ ঘুরে এলে যে রুচিবান বাঙালিরও রুচির উন্নতি হয়, বাগানে ঘুরলেই তা নজরে পড়ে।

'একি? স্ট্রবেরি?'

'মণিকা জবাব দেয়, হ্যাঁ।'

ক্যাপ্টেন একটা সিগারেট ধরিয়ে মণিকার দিকে ফিরে বলল, 'বাঙালি একটু বাইরে ঘুরে-ফিরে এলে দৃষ্টিভঙ্গিটা অনেক পাল্টে যায়, তাই না?'

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মণিকা বলে, 'হঠাৎ একথা বলছেন?'

'এই আপনাকে আর ওই স্ট্রবেরি গাছটা দেখে মনে পড়ল।'

'তার মানে?'

'বাংলাদেশের বাঙালির বাগানে আম-জাম-কলা পাবেন, পাবেন না স্ট্রবেরি।'

'কিন্তু তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?'

'হ্যাড ইউ বিন এ পিওর বেঙ্গলি গার্ল, তাহলে কি এত ফ্রি হতে পারতেন?'

'হোয়াট ডু ইউ মীন বাই এ পিওর বেঙ্গলি গার্ল?'

'মানে আপনার জন্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুই যদি বাংলাদেশে হতো...'

ক্যাপ্টেন এক ঝলক দেখে নেয় মণিকাকে। মণিকা মাথা নিচু করে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। খোঁপাটা ঢিলে হয়ে ঘাড়ের কাছে পড়েছে। কানের পাশ দিয়ে লম্বা জুলফির চুলগুলো ওর গালের উপর এসে পড়েছে। ক্যাপ্টেনের বেশ লাগছে ওকে দেখতে।

মণিকা এবার মুখ উঁচু করে ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বলে, 'তাহলে কি হতো?'

'কি না হতো বলুন? আপনার সঙ্গে আমার মেলামেশার সুযোগ হতো?'

কলকাতার কলেজ-ইউনিভার্সিটির কিছু ছেলেমেয়ে কমনরুমে বা কফি হাউসে একসঙ্গে গল্প-গুজব-আড্ডা দিলেও সহজ-সরলভাবে মেলামেশার পথে অনেক বাধা অনেক বিপত্তি।

সে কথা মণিকা জানে। জানে কলকাতা শহরে পাশাপাশি বাড়িতে ওরা দু'জনে আজন্ম বাস করার পরও ক্যাপ্টেন বলতে পারত না চল মণিকা একটু বেড়িয়ে আসি। কিন্তু কলকাতার

বাইরে বরাকরের ওপারে পাটনা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বোম্বের বাঙালি ছেলেমেয়েরা অনেক ঘনিষ্ঠ হতে পারে। শুধু ছেলে-মেয়েরা কেন? মা-বাবাও।

তাইতো ক্যাপ্টেন বলল, 'আপনার বাবা যদি শেয়ালদা কোর্টের উকিল হতেন আর সারপেনটাইন লেনেই সারাজীবন কাটিয়ে দিতেন তাহলে কি তার মেয়েকে এত স্বাধীনতা দিতেন?'

বাগানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দুচারটে পাখির ডাক হয়তো কানে এসেছিল ক্যাপ্টেনের। ঢলে পড়া সূর্যের গোলাপি রশ্মি বোধহয় মনটাকেও একটু রঙিন করেছিল। 'বনমালী না থাকলে আপনাকে একটা গান গাইতে বলতাম।'

মণিকা হাসি চাপতে পারে না, 'বনমালীকে এত ভয় কেন?'

'ভয় না করলেও ওর বিরক্তিতে ভবিষ্যৎ নষ্ট করব কেন?'

মজা লাগে মণিকার, 'তার মানে?'

'আজ নয় পরে বলব।'

বেশ কেটেছিল সেদিনের অপরাহ্ন। বিদায়বেলায় বনমালী এক টুকরি ভর্তি পাকা পেঁপে দিয়ে বলেছিল, 'দিদিমণি মাকে বলো এগুলো কালকের মধ্যেই খেয়ে ফেলতে, নয়তো নষ্ট হয়ে যাবে।'

মণিকা এক ফাঁকে বনমালীকে ক্যাপ্টেনের পরিচয় দিয়ে এসেছিল। ক্যাপ্টেন তা জানত না।

বনমালী ক্যাপ্টেনকে বলল, 'আপনি লাটসাহেবের বাড়িতে থাকেন, কত মস্ত লোক। দয়া করে যে এসেছেন...'

ক্যাপ্টেন আর এগোতে দিল না। মণিকার দিকে ফিরে বলল, 'এর ফাঁকে কখন ওকে এসব শিখিয়ে পড়িয়ে এলেন?'

মিটমিট করে হাসতে হাসতে মণিকা বলল, 'হ্যাঁ বনমালীদা, তোমাকে আমি কিছু শিখিয়েছি?'

বনমালী অত সাদা মিথ্যা কথাটা বলতে পারল না। মণিকার কথার কোনো জবাব না দিয়ে ক্যাপ্টেনকে বলল, 'সময় পেলে দয়া করে আসবেন।'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে যশোর রোডের ওপর আসার পরই ক্যাপ্টেন মণিকাকে বলল, বনমালীকে বলে দেবেন আমি মাঝে মাঝেই আসব।'

মণিকা বলল, 'তাই নাকি?'

কলকাতা ফেরার পথে গাড়ির স্পীডটা বেশ কম ছিল।

মণিকা জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার? এত আস্তে চালাচ্ছেন? গাড়িতে কোনো ট্রাবল...'

'জোরে চালালেই তো এক্ষুনি সব ফুরিয়ে যাবে।'

মণিকা কিছু বলে না। ক্যাপ্টেনও একটু চুপ করে থাকে। তারপর আবার বলে, 'ওই গরাদখানায় যেন আর মন টেঁকে না।'

দূর থেকে রাজভবনের মানুষগুলোকে কত সুখী মনে হয়। মনে হয় ওরা সবাই সুখ-সম্ভোগ আনন্দ-বিলাসে মত্ত। ওখানে যারা থাকে, তাদের কি সাধারণ মানুষের মতো সুখ-দুঃখের অনুভূতি থাকে? দূর থেকে যারা রাজভবনকে দেখে তারা মনে করে, না। এত প্রাচুর্য, আনন্দবিলাসের মধ্যে কি দুঃখ থাকতে পারে?

ক্যাপ্টেনকে দেখে মণিকার উপলব্ধি হয়েছে, না ওখানকার সবাই সুখী হয়। মধ্যমগ্রাম থেকে কলকাতা ফেরার পথে সে কথাটা আরো বেশি করে উপলব্ধি করল।

'এ-ডি-সি হবার আগে কি করে সময় কাটাতেন?'

'আর্মি লাইফে একটা সুন্দর উত্তেজনা আছে। বেশ কাটত দিনগুলো। কিন্তু এখানে তো কেউ প্রাণ খুলে হাসতেও পারে না।'

'হোয়াট অ্যাবাউট গভর্নর?'

দুঃখের মধ্যেও ক্যাপ্টেনের হাসি পায়। 'তাঁর অবস্থা আরো সঙ্গীন। আমি তো আমজাদের সঙ্গে গল্প করতে পারি, মণিকা ব্যানার্জিকে নিয়ে মধ্যমগ্রামে যেতে পারি, ভবিষ্যতে সিনেমা দেখতে পারি...'

ক্যাপ্টেনের কথা শুনেই মণিকা হাসে, 'কে বলল আপনার সঙ্গে আমি সিনেমায় যাব?'

কথাটা যেন কানেই তুলল না ক্যাপ্টেন।...'লাটসাহেবের তো সে স্বাধীনতাও নেই।'

রাজভবনের কথা আর কাকে বলবে? না বলে মনে শান্তি পায় না ক্যাপ্টেন রায়। লাটসাহেবের অসহায় অবস্থার কথাও বলে।

'বিশ্বাস করুন ব্যারাকপুরের গঙ্গার ধারে ওই বাগানবাড়ি আর দার্জিলিং গভর্নমেন্ট হাউসে ছাড়া অন্য কোথাও যেতে হলেই লাটসাহেবকেও চীফ মিনিস্টারের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হয়।'

মণিকা অবাক হয়ে বলে, 'রিয়েলি?'

'কত সরকারি অনুষ্ঠানে লাটসাহেবকে নেমন্তন্ন করেও পরে ক্যানসেল করা হয় চীফ মিনিস্টারের ইচ্ছায়...'

হাঁটু দুটোকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে বসে থাকতে থাকতে মণিকা আবার প্রতিবাদ করে, 'কি যা তা বলছেন?'

ভ্রু কুঁচকে মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবে মণিকা। তারপর আবার বলে, 'আপনি এ-ডি-সি বলে ইউ কান্ট সে হোয়াট এভার ইউ লাইক।'

ক্যাপ্টেন রায় হাসে। হাসতে হাসতে চেয়ে থাকে মণিকার দিকে। কিছু বলে না, যেন বলতে চায় না।

ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে মণিকাও হাসে, 'কি? ভেবে দেখছেন এবারে কি বানিয়ে বানিয়ে বলবেন?'

ক্যাপ্টেন হাসতে হাসতেই বলে, 'মিথ্যা কথা বলে আমার কি লাভ? তাছাড়া আপনাকে আমি মিথ্যা কথা বলব?'

কথাটা বড় ভালো লাগে মণিকার। সংযত সংহত পরিবেশের মধ্যেও একটু যেন নিবিড়তা অনুভব করে।

চোখ দুটো বড় বড় করে মণিকা বলে, 'আমাকে মিথ্যা কথা বলতে নেই?'

একটু ভেবে উত্তর দেয় ক্যাপ্টেন, 'না, ঠিক তা নয়; তবে আপনাকে মিথ্যা কথা বলে আমিই মনে মনে শান্তি পাব না।'

লাটসাহেবের দুরবস্থার আরো অনেক কাহিনি মণিকাকে বলেছিল ক্যাপ্টেন রায়। 'যাঁকে প্রতি পদক্ষেপে স্যালুট করব, যাঁর হুকুম তামিল করাই আমাদের কাজ, তাঁর এই অসহায় অবস্থা

দেখে আমাদেরই খারাপ লাগে।'

সরকারি-বেসরকারি অফিসে ছোট-বড় অফিসারদের অপমান দেখতে দেখতে অভ্যস্ত থাকেন তাদের সহকর্মীরা কিন্তু আর্মিতে এসব দেখা দুর্লভ ব্যাপার, অসম্ভব ব্যাপার। তাই তো এ-ডি-সি-র চাকরি করতে এসে ক্যাপ্টেন রায় মনে মনে আহত হন প্রতি পদক্ষেপে। উত্তরবঙ্গের সর্বনাশা বন্যার খবর কলকাতায় পৌঁছাবার পর পরই লাটসাহেব ঠিক করলেন নিজের চোখে দেখে আসবেন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা। রাইটার্স বিল্ডিংস-এ লাটসাহেবের অভিপ্রায়ের খবর পৌঁছাবার একটু পরই লাটসাহেবের সেক্রেটারিকে জানান হলো, 'না না, এক্ষুনি লাটসাহেবের যেতে হবে না। সমস্ত সরকারি কর্মচারীরা উদ্ধার কার্যে ব্যস্ত। লাটসাহেব গেলে এইসব জরুরি কাজকর্ম বন্ধ করে তাঁর দেখাশুনা করতে হবে সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের।'

অথচ...

দু'দিন পরই চীফ মিনিস্টার নিজে গেলেন নর্থ বেঙ্গল।

মণিকা ঠিক বুঝতে পারে না তাৎপর্য, 'তাতে কি হলো?'

'প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর যে ভি-আই-পি প্রথম যান, তাঁর ছবি, নিউজ খবরের কাগজে বেশি ছাপা হয়। ফিল্ম ডিভিশনের নিউজ রিলে বা রেডিওতে বেটার কভারেজ পায় সুতরাং...

রাজভবনের জীবন গতানুগতিকভাবে কাটে। সেই একই ইউনিফর্ম, স্যাফরন আর্মড্-ব্যাচ ; সেই সেলাম দেওয়া, সেলাম নেওয়া। সেই সভা-সমিতি, ডিনার-ড্যান্স-কক্টেল।

ক্যাপ্টেন রায় অভিনবত্ববোধ করে না এই নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে। সকাল থেকে সন্ধ্যা, কত জনের সঙ্গে দেখা হয়, আলাপ হয়। হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজবও হয় কিন্তু তাদের সঙ্গে নিবিড় হয়ে মিশতে উৎসাহবোধ করেন না। এসব কথা মণিকা জানে।

বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করার জন্য লাটসাহেবের সঙ্গে ক্যাপ্টেন রায়ও দু'দিন বাঁকুড়া ঘুরে এল। মফঃস্বল শহরে গভর্নর এলেই একটু বেশি হৈ চৈ হয়। বাঁকুড়াতেও তার ব্যতিক্রম হলো না। বৃদ্ধ লাটসাহেবের পক্ষে এসব সহ্য করা সহজ নয়।

কলকাতায় ফিরেই লাটসাহেব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হিজ একসেলেন্সির সব প্রোগ্রাম-এনগেজমেন্ট বাতিল করা হলো। চীফ মিনিস্টারও তখন কলকাতার বাইরে। গভর্নরের দস্তখতের জন্য সরকারি কাগজপত্র আসাও কদিন বন্ধ ছিল।

অনেকদিন পর সেদিন আবার মণিকা এসেছিল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে গল্প করতে। বড় সোফাটায় দুটো পিলো মাথায় দিয়ে ক্যাপ্টেন কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে গুল্প করছিল মণিকার সঙ্গে। হঠাৎ টেলিফোন বাজল। বেশ বিরক্ত হয়েই ক্যাপ্টেন উঠে গেল টেলিফোন ধরতে।

ডান হাত দিয়ে চেয়ারটা টানতে টানতেই বাঁ হাত দিয়ে রিসিভারটা তুলল, 'ক্যাপ্টেন রয় হিয়ার?'

একটু পরেই ক্যাপ্টেনের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল, 'গুড আফটারনুন, মিস গুপ্তা। কেমন আছেন?'

মিস গুপ্তা শুনতেই মণিকা ঘাড় বেঁকিয়ে একবার ক্যাপ্টেনকে দেখল।

একটু পরে ক্যাপ্টেন মিস গুপ্তাকে বলল, 'মিঃ গর্ডন বোধহয় এ মাসের শেষের দিকে কলকাতা আসছেন। আই উইল সার্টেনলি ইনফর্ম ইউ হোয়েন হি কামস।'

ক্যাপ্টেন একটু থামল। মণিকা আর একবার দেখল, হাসল।

'নো নো মিস গুপ্তা। বিরক্ত হবো কেন? ইট ইজ এ প্রিভিলেজ টু গেট এ কল ফ্রম ইউ।'

ক্যাপ্টেন টেলিফোন নামিয়ে রেখে ফিরে আসতেই মণিকা বলল, 'আই অ্যাম সরি।'

'কেন?'

'আমার জন্য একটু প্রাণ খুলে কথা বলতে পারলেন না?'

ক্যাপ্টেন একটু মুচকি হাসল। 'চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।'

নিচের ঠোঁটটা একটু কামড়ে মণিকা বলে, 'ট্রাই এগেন অ্যান্ড এগেন। নাউ ইউ হ্যাভ মাই বেস্ট উইসেস।'

কলকাতা রাজভবনের একটা ট্রাডিশন আছে, মর্যাদা আছে, মোহ আছে। সমাজের পাঁচজনের মধ্যে একজন হতে হলে রাজভবনের সঙ্গে একটু মিতালি থাকা প্রয়োজন।

এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। লাটসাহেবের উমেদারী করে অনেকেই সমাজে এই স্বীকৃতি লাভ করেন। যাঁরা পলিটিক্স করেন, স্বপ্ন দেখেন রাইটার্স বিল্ডিং-এর দোর গোড়ায় সাব ইন্সপেক্টর সেলাম দিচ্ছে, তাঁদের ইষ্টদেবতা লাটসাহেব নয়। যাঁরা পলিটিসিয়ান কাম সোস্যাল ওয়ার্কার কাম বেনামী বিজনেসম্যান, যাঁরা অন্য কোথাও কল্কে পান না, তাঁরাই লাটসাহেবের সান্নিধ্য লাভের জন্য একটু বেশি লালায়িত।

এদের ড্রইংরুমে, অফিস ঘরে লাটসাহেবের ফটো লটকান থাকে। সুতরাং চিনতে কষ্ট হয় না। রাজভবনের সঙ্গে আরো বহু ধরনের মানুষের যোগাযোগ আছে। কারণে, অকারণে। প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে। এদের সবাইকেই চেনা যায়, জানা যায়, বোঝা যায়।

বোঝা যায় না, জানা যায় না আরতি সরকার, শ্যামলী গুপ্তা, অলকা মিত্র, উজ্জ্বলা সেনকে। বাইরের কেউ জানতে না পারে, বুঝতে না পারে কিন্তু এ-ডি-সি? নাটকের অন্তিম দৃশ্য দুচোখ দিয়ে না দেখলেও সব কিছু বুঝতে পারে, জানতে পারে।

ক্যাপ্টেন টেলিফোন শেষ করে ও পাশের সোফায় বসে একটা সিগারেট ধরাল। দৃষ্টিটা হয়তো মুহূর্তের জন্য ইউক্যালিপটাস গাছের ফাঁক দিয়ে একটু ঘুরে এলো।

মণিকা একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'মনটা একটু উদাস হয়ে গেল, তাই না?' মুচকি হাসতে হাসতে চেয়ে রইল ক্যাপ্টেনের দিকে।

ক্যাপ্টেন হাসল। 'আমার ওপর রাগ হয়েছে তো?'

'না, রাগ করব কেন?'

'মিস গুপ্তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললাম বলে।'

'আফটার অল আপনি একজন আর্মি অফিসার ; তারপর আবার এ-ডি-সি। সুতরাং আপনার সঙ্গে যে শুধু মণিকা ব্যানার্জির আলাপ নেই...'

ক্যাপ্টেন বাধা দেয়, 'তবু বলবেন রাগ করেননি?'

'না না, রাগ করব কেন?'

'আপনার সামনে থেকে সিগারেট তুলে নিলাম, কই আপনি তো লাইটার জ্বেলে ধরলেন না?'

মণিকা লজ্জা পায়। 'সরি।'

ক্যাপ্টেন কিন্তু মনে মনে খুশি হয়! ভালোবাসা না থাকলে কি ঈর্ষা আসে?

'মিছিমিছি সন্দেহ করবেন না। এখানে চাকরি করতে এসে আপনাদের কলকাতার অনেক কিছু জানলাম! ভবিষ্যতে সুযোগ এলে আপনাকে বলব।'

মণিকা, আবার একটু মুচকি হাসে। 'মিস গুপ্তার স্টোরি বলার দিন কি অ্যাট-অল আসবে?'

'আই হোপ সো বাট ইট ডিপেন্ড্স অন ইউ।'

'তার মানে?'

'শ্যামলী গুপ্তার স্টোরি এখন আমি বলতে পারব না, আপনি শুনতেও পারবেন না।'

'কেন?'

ক্যাপ্টেন একটু ভাবে। 'আমাদের পরিচয়টা আরো একটু গভীর না হলে ওইসব মেয়েদের কাহিনি বলতে ও শুনতে দুজনেরই লজ্জা করবে।'

টানা টানা ভ্রু দুটো উঁচু করে মণিকা বলে, 'ইজ, ইট সো রোমান্টিক?'

'নট রোমান্টিক বাট ভালগার!'

মণিকা সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'শুনেছি অধিকাংশ পুরুষই ভালগারিটি পছন্দ করে।'

মিছিমিছি কথা কাটাকাটি করে চলে দু'জনে বেশ কিছুক্ষণ।

শেষে মণিকা বলে, 'তর্ক করছি বলে কি একটু কফিও খাওয়াবেন না।'

ক্যাপ্টেন লজ্জিত হয়। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'আপনার সঙ্গে কথা বলতে গেলে আর সব কিছু গুলিয়ে ফেলি।'

'শ্যামলীর সঙ্গে কথা বলার সময় তো মনে হলো না কিছু গুলিয়ে ফেলেছেন?'

'কান্ট ইউ ফরগেট শ্যামলী?'

'এমন একটা রোমান্টিক ক্যারেকটারকে চট করে ভোলা যায় না?'

একটু থেমে মণিকা আবার জানতে চায়, 'আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কি গুলিয়ে ফেললেন?'

'আমার কলিগ ন্যাভাল এ-ডি-সি ও তাঁর স্ত্রী আপনাকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছে।'

'কোথায়?'

'এইতো নর্থ গেটের সামনেই ওদের কোয়ার্টারে।'

'কেন বলুন তো?'

'কেন আবার? আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।'

'আপনি বুঝি ওদের কাছে আমার কথা বলেছেন?'

'বলেছেন মানে? রেগুলার আপনার কথা বলি।'

'সব কিছু বলেছেন?'

'ওদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবার মতো এখনও তো কিছু হয়নি। তেমন কিছু হলে নিশ্চয়ই বলব না।'

কথাটা শুনেই মণিকার সারা মুখটা লাল হয়ে ওঠে। সলাজ চোখের দৃষ্টিটা আনত হয়। ক্যাপ্টেন মুগ্ধ হয়ে দেখে।

কয়েক মিনিট এমনিভাবে কেটে গেল।

তারপর ক্যাপ্টেন বলল, 'সুড আই টেল মাই কলিগ অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ দ্যাট ইউ আর হিয়ার?'

'বলুন।'

ক্যাপ্টেন টেলিফোনে লেফটেন্যান্ট ভাটিয়াকে জানাল, 'মণিকা ইজ হিয়ার।'

ভাটিয়া কি যেন বলল।

'অ্যাডমিরাল ইজ কামিং? ওয়ান্ডারফুল!'

ক্যাপ্টেন রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই মণিকা প্রশ্ন করল, 'অ্যাডমিরাল কে?'

'ভাটিয়ার স্ত্রী সুনীতা। ওকে আমি অ্যাডমিরাল বলি।'

ক্যাপ্টেন আবার একটা সিগারেট তুলতেই মণিকা বলল, 'আবার সিগারেট ধরাচ্ছেন যে?'

'তাতে কি হলো?'

'জামা-কাপড় চেঞ্জ করবেন না?'

'অ্যাডমিরালের ওখানে যাবার জন্য পায়জামা-পাঞ্জাবিই যথেষ্ট।'

'না না। চেঞ্জ করে নিন।'

ক্যাপ্টেন চেঞ্জ করে বেরুতে না বেরুতেই সুনীতা এসে মণিকার সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিল।

'গুড আফটার নুন অ্যাডমিরাল! কখন এলেন?'

সুনীতা বলল, 'আর কথা নয় চলুন তাড়াতাড়ি।' মণিকার দিকে ফিরে বলল, 'চলুন ভাই।'

পরিচিতের সীমা যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন সবার ভালো লাগতে নাও পারে কিন্তু স্বীকৃতি যখন ছড়িয়ে পড়ে আপন পর পরিচিত-অপরিচিতের মধ্যে তখন সবার ভালো লাগে। মণিকারও!

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একটা সুন্দর মিষ্টি প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সে সম্পর্ক অসামাজিক না হলেও সামাজিক নয়। কিছুটা স্নেহমমতা ভালোবাসা। বাংলাদেশের বাইরে বিদেশে বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে কিছুটা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের জন্য মা-বাবা মণিকাকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে মেলামেশা করতে বাধা দেননি। কিন্তু বৃহত্তর সমাজের কাছে এই পরিচিতির স্বীকৃতি মণিকা আশা করে না।

লেফটেন্যান্ট ভাটিয়া ও সুনীতার কাছে সেই স্বীকৃতি পেয়ে বড় ভালো লাগল মণিকার।

'আপনি শুনে অবাক হবেন ইওর গ্রেট ফ্রেন্ড নেভার টোল্ড আস এনিথিং অ্যাবাউট ইউ।'

সুনীতা বাঁকা চোখে ক্যাপ্টেনের দিকে কটাক্ষ করে মণিকাকে বলল।

মণিকা একটু হাসে। বলে, 'আমার সম্পর্কে কিছুই বলবার নেই।'

'আপনার বলবার কিছু না থাকলেও আমাদের শোনার অনেক কিছু আছে।'

এবার ক্যাপ্টেন বলে, 'সুনিতা, ডোন্ট ট্রাই টু রিড বিটুইন দি লাইন্‌স্‌।'

'আমরা দুজনে কথা বলছি। এর মধ্যে তো আপনার মাথা গলাবার দরকার নেই।'

বেশ লাগে মিসেস সুনীতা ভাটিয়াকে।

পরে মণিকা ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এদের সঙ্গে আগে পরিচয় করিয়ে দেননি কেন বলুন তো?'

'আগে আমার সঙ্গে ভালো করে পরিচয় হোক।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ভালো করে পরিচয়?

'আই মিন হোয়াট আই সে।'

ক্যাপ্টেন একটু থামে। একবার দেখে নেয় মণিকাকে। মণিকাও ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে দেখে। মাঝপথে দেখা হয়।

এমন খুশির আমেজের সময়ই মণিকার মনে পড়ে মিস শ্যামলী গুপ্তার কথা।

'তারপর বলুন মিস গুপ্তার কি ব্যাপার।'

'এত গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টার পরেও মিস গুপ্তাকে ভোলেননি?'

'ভুলব কেমন করে? গভর্নরের এ-ডি-সি-র সঙ্গে কলকাতার টপ-এর সোসাইটি গার্লের পরিবারে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ব্যাপারে কার জানার আগ্রহ হয় না বলুন?'

ক্যাপ্টেন বলে, 'ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছি আপনার সঙ্গে আর লোকের আগ্রহ হবে মিস গুপ্তার খবর জানতে?'

'আমার মতো সাধারণ মেয়েকে নিয়ে দুনিয়ার কেউ আলোচনা করবে না।'

ফোর্ট উইলিয়ামের পাশ দিয়ে হেস্টিংস-এর দিকে এগোতে এগোতে ক্যাপ্টেন একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আই উইস আই কুড সে হোয়াট আই ফিল লাইক সেইং।'

'কি বলতে চান বলুন। আমি কি আপনাকে বারণ করছি?

'বারণ করেননি ঠিকই, তবুও...'

ক্যাপ্টেন আর এগোতে পারে না।

মণিকাও নিশ্চয় জানতে চায় ক্যাপ্টেনের মনের কথা। 'নদীর পাড় দিয়ে হাঁটলে তো কোনোদিনই নদী পার হতে পারবেন না...'

মণিকাকে আর বলতে হয় না।

ক্যাপ্টেন বলল, 'তবে বলছেন এবার নদীতে ঝাঁপ দিতে পারি?'

মণিকা মজা করে। 'সাহস থাকলে নিশ্চয়ই ঝাঁপ দেবেন।'

'সাহস না আগ্রহ?'

'দুই-ই?'

একটু পরেই মণিকা আবার বলল, চলুন আমাকে পৌঁছে দেবেন।'

'এক্ষুনি?'

'অনেকক্ষণ তো বেরিয়েছি।'

ক্যাপ্টেন মনে মনে বলে, আচ্ছা মণিকা এখনও তোমার বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছা করে? ভালো লাগে?

মনে মনে আরো কত কথা জানতে চায়, বলতে চায়, শুনতে চায় কিন্তু পারে না।

ক্যাপ্টেন ওইসব ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে যায়।

'কি ভাবছেন?'

ক্যাপ্টেনের হুঁশ ফিরে আসে। 'না, না কিছু ভাবছি না।'

'এমন কি ভাবছেন যা বলতে এত সঙ্কোচ?'

একটু শুকনো হাসি হাসল ক্যাপ্টেন। বলে, 'ঠিকই ধরেছেন। বড় সঙ্কোচ, বড় দ্বিধা। কবে যে এর থেকে মুক্তি পাব।'

আর দেরি করে না। একটা ট্যাক্সি কাছে আসতেই দুজনে হাত তুলল। থামাল। চড়ল।

বাড়ি পৌঁছেই মণিকা সামনের বাঁ দিকের ঘরে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, বাবা কোথায়?'

'ডক্টর চৌধুরি এসে তোর বাবাকে নিয়ে গেলেন।'

ক্যাপ্টেনকে দেখে মিসেস ব্যানার্জি খুশি হলেন, 'এসো, এসো ভিতরের ঘরে চলো।'

এবার মণিকার দিকে ফিরে বললেন, 'এতক্ষণ বেরিয়েছিস, একটা টেলিফোন তো করতে পারতিস্।

মণিকার জবাব দেবার আগেই ক্যাপ্টেন বলল, 'আর বলবেন না মাসিমা। আমার কলিগ এ-ডি-সি ভাটিয়ার স্ত্রীর সঙ্গে এমন গল্পের মশগুল হয়েছিলেন যে অনেক বলবার পরও উঠেছিলেন না!'

হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে দূরের সোফায় ফেলে মণিকা বলল, 'আপনি কটা মার্ডার করেছেন বলুন তো?'

. 'মার্ডার?' চমকে ওঠে ক্যাপ্টেন।

'এমন সুন্দর করে যে মিথ্যা কথা বলতে পারে, সে মার্ডার করে না?'

ক্যাপ্টেন এবার মিসেস ব্যানার্জির সাহায্য সহানুভূতি চায়, 'দেখছেন মাসিমা, কি বলছেন?'

'আঃ। কি যা তা বলছিস?' মণিকাকে শাসন করে ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'যাও বাবা, তুমি ও ঘরে গিয়ে বসো আমি আসছি।'

'খালি হাতে আসবেন না। প্লেট ভর্তি করে কিছু আনবেন।'

সবাই হাসে!

হাসি চাপতে চাপতেই মণিকা জানতে চায়, 'এমন করে বলতে আপনার লজ্জা করে না?'

'সরি! খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আবার লজ্জা কিসের?'

'মা-মাসির কাছে আবার লজ্জা কিসের?'—বলেই মিসেস ব্যানার্জি চলে গেলেন।

মণিকা ক্যাপ্টেনকে নিয়ে ওপাশের বসার ঘরে এসে বলল, 'বসুন।'

ক্যাপ্টেন বসল না। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো মণিকার কাছে। খুব কাছে। একেবারে মুখের কাছে, কানের পাশে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'আপনাকেই প্রথম মার্ডার করব। রক্তটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। খুব বেশি দিন ধৈর্য ধরতে পারব না।'

ক্যাপ্টেন কোনোদিন এত কাছে, এত নিবিড় হয়ে এগিয়ে আসেনি। ক্যাপ্টেনের টানা বড় বড় নিশ্বাস মণিকার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। অপারেশন থিয়েটারের ক্লোরফর্মের মতো ক্যাপ্টেনের নিশ্বাস যেন মণিকাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মুখে কিছু বলল না। শুধু অবাক-বিস্ময় মাখা মুগ্ধ নয়নে চাইল ক্যাপ্টেনের দিকে।

মণিকা চলে যাবার একটু পরেই মিসেস ব্যানার্জি এলেন।

টুকটাক কথাবার্তা বলার পর মিসেস ব্যানার্জি বললেন, 'একবার তোমার সঙ্গে এলাহাবাদ ঘুরে আসব।'

'নিশ্চয়ই। মা-বাবা ভীষণ খুশি হবেন।'

ঘরে ঢুকতে গিয়ে মণিকার কানে কথাটা গিয়েছিল।

'তুমি ওর কথা বিশ্বাস কর মা?'

'কেন করব না?'

'গুরুজনেরা যখন কথা বলেন তখন মাঝখান থেকে হঠাৎ কোনো কথা না বলাই ভদ্রতা।' ক্যাপ্টেন বেশ গম্ভীর হয়ে বলে।

মণিকা হাসি চাপতে পারে না, 'আপনিও আমার গুরুজন নাকি?'

ক্যাপ্টেন আবার মিসেস ব্যানার্জির শরণাপন্ন হয়। 'আচ্ছা মাসিমা উনি আমার চাইতে বয়সে ছোট না?'

'তা তো বটেই।'

'আজকের থেকে আমি আর আপনাকে আপনি বলব না।' ক্যাপ্টেন সাফ জানায় মণিকাকে। মিসেস ব্যানার্জির দিকে ফিরে বলল, 'ঠিক বলেছি না মাসিমা?'

'ও যখন তোমার চাইতে বয়সে ছোট তখন আর আপত্তি কি!'

মণিকা প্রতিবাদ করতে যাবার আগেই ক্যাপ্টেন বলল, 'দেখ তো মণিকা, আমার চা-টা হলো কিনা।'

মিসেস ব্যানার্জি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, 'না, না, আমিই যাচ্ছি।'

মিসেস ব্যানার্জি চলে যাবার পরই মণিকা বলল, 'আজ আপনার কি হয়েছে বলুন তো?'

ক্যাপ্টেন হঠাৎ মণিকার হাতটা চেপে ধরে বলে, 'তোমার কিছু হয়নি?'

এই রাজভবনে বসেই একদিন পলিটিক্যাল লিডারের কাছে পুরনো দিনের গল্প শুনছিল ক্যাপ্টেন রায়। গভর্নরের সঙ্গে একদল পুরনো দিনের বিপ্লবীদের মিটিং ছিল। মিটিং শেষে সবাই চলে গেলেন। শুধু গেলেন না উনি। গভর্নরের প্রোগ্রাম সম্পর্কে এ-ডি-সি-র সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন।

কথায় কথায় আলোচনার মোড় ঘুরে যায়!

'জীবনে এই দ্বিতীয়বার গভর্নমেন্ট হাউসে এলাম।'

'মাত্র দুবার?'

'হ্যাঁ।' পুরনো দিনের বৃদ্ধ বিপ্লবী একবার যেন চারপাশটা দেখে নিলেন। 'দেশ স্বাধীন হবার পর আজই প্রথম গভর্নমেন্ট হাউসে এলাম।'

'তাই নাকি?'

বিপ্লবী ঘোষ মশাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ, আজই প্রথম।'

ক্যাপ্টেন রায় জানতে চাইল, 'এর আগেও কি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?'

বৃদ্ধ আর হাসি চাপতে পারলেন না।

ক্যাপ্টেন অবাক হয় ওর হাসি দেখে। জিজ্ঞাসা করে, 'হাসছেন যে?'

হাসি থামার পর ঘোষ মশাই শোনালেন পুরনো দিনের সে কাহিনি।

'পুলিশ কমিশনার টেগার্ড সাহেবের নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছ। বিপ্লবীদের অ্যারেস্ট করে লালবাজারে আনার পর টেগার্ড সাহেব তাঁদের প্রথম অভ্যর্থনা জানাতেন মুখে থুতু ছিটিয়ে...'

'ক্যাপ্টেন অবাক হয়, 'থুতু ছিটিয়ে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিপ্লবীদের হাজির করা মাত্রই উনি আগে ওদের মুখে থুতু ছিটিয়ে দিতেন। টেগার্ড সাহেবের সঙ্গে সর্বদা একটা হেড কনস্টেবল ও একজন সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর থাকত। ওরা দুজনে অকথ্য অত্যাচার করতে ওইসব বিপ্লবীদের ওপর। টেবিলের ওপর বসে চুরুট খেতে খেতে টেগার্ড সাহেব সে দৃশ্য উপভোগ করতেন আর মাঝে মাঝে খেয়াল খুশি মতো বিপ্লবী ছেলেমেয়েদের কাপড় তুলে বিশেষ বিশেষ স্থানে জ্বলন্ত সিগার চেপে ধরতেন।...

ক্যাপ্টেন শিউরে উঠে। 'বলেন কি জ্বলন্ত সিগার চেপে ধরতেন?'

'ইয়েস ইয়েস জ্বলন্ত সিগার! আপনার সঙ্গে যিনি কথা বলছেন তাঁর দেহেও এমনি অনেক স্মৃতিচিহ্ন আজও দেখতে পাবেন।'

'মাই গড!'

'জ্বলন্ত সিগার তবু সহ্য করা যেত কিন্তু ওই দুজনের অত্যাচার সহ্য করা যেত না।'

'নিউ ইয়ার্স ইভ-এ তখন গভর্নমেন্ট হাউসে বিরাট পার্টি হতো। টেগার্ড সাহেবও আসতেন। জানতাম টেগার্ড সাহেবের ওই দুজন সাকরেদ একটু আধটু প্রসাদ পাবার পর নিজেদের সামলাতে পারবে না। তাই ওদের সঙ্গে একটু মোলাকাত করার জন্য...

'গভর্নমেন্ট হাউসে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিভাবে এলেন?'

'বৃদ্ধ আবার একটু হাসলেন। 'একজন গেস্টের ড্রাইভার হয়ে এসেছিলাম।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি? মাত্র একটা কার্তুজই খরচ করেছিলাম...'

গভর্নমেন্ট হাউসে ফায়ারিং-এর খবর শুনেই উত্তেজিত হয় এ-ডি-সি। 'দেন হোয়াট্ হ্যাপন্ড্?'

'বিশেষ কিছু না। টুকটাক আদর-আপ্যায়ন ও বিচারের প্রহসনের পর কিছুদিনের জন্য আন্দামান সেলুলার জেলে...'

ঘোষমশাই আর এগোতে পারলেন না। তিন-চারজন সোসাইটি লেডি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে এ-ডি-সি-র ঘরে ঢুকলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে একজন বললেন, 'উই উইল বি কামিং টু ইউ এগেন আফটার এ ফিউ ডেজ।'

'উইথ প্লেজার। আই উইল বি অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস।' ক্যাপ্টেন ঈষৎ মাথা নিচু করে হাসি হাসি মুখে কথাকটি বলে বিদায় জানাল।

মেয়েরা চলে যাবার পর ঘোষমশাই বললেন, 'তখনকার দিনে পুরুষের চাইতে মেয়েরাই বেশি গভর্নমেন্ট হাউসে আসত, আজকালও কি...'

ঘোষমশাই আরো একটু কিছু বলে বোঝাতে চেয়েছিলেন তখনকার দিনে যেসব মহিলারা আসতেন তাঁরা বিশেষ সতী-সাধ্বী পতিপ্রাণা ছিলেন না। 'আজকাল কি শুধু সোশ্যাল ওয়ার্কাররাই আসেন?'

ক্যাপ্টেন কোনো জবাব দেয়নি। হঠাৎ টেলিফোন তুলে উত্তর এড়িয়ে গেল।

বৃদ্ধ বিদায় নেবার আগে বললেন, 'এইসব মেয়েদের দেখলে গান্ধীজির একটা কথা মনে হয়।'

'কোন কথা?'

'কদিন কলকাতা থেকে অনেক ঘোরাঘুরি করেও গান্ধীজি রাস্তাঘাটে মেয়েদের বিশেষ দেখতে না পেয়ে বলেছিলেন, 'বাঙালি মেয়েরা কি বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেছে?'

আর আজকাল?

আফটারনুন ডিউটি। বিশেষ কাজের চাপ ছিল না। অফিসে বসে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেতে খেতে ঘোষ মশাই-এর কথা ভাবছিল ক্যাপ্টেন। হঠাৎ রিভলভিং চেয়ারটা ঘুমিয়ে নিয়ে পাম গাছের ফাঁক দিয়ে দূরের আকাশ দেখল। মনে পড়ল মিস শ্যামলী গুপ্তা ও আরো অনেকের কথা।

আবার সিগারেট টানে। চারপাশটা ধোঁয়ায় ভরে যায়। রাজভবনের শত শত অতিথির আগমন ও বিদায়ের ভিড়ের মধ্যেও মিস গুপ্তার আকস্মিক দৃষ্টি এড়ায় না। সোশ্যাল ওয়ার্কারের ছদ্মবেশে একটু যোগাযোগ, ঘনিষ্ঠতা, পরে ইন্ডিয়ান হসপিটালিটির অছিলায় হোটেলে...গেস্টহাউসে—থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটে আরো নিবিড়, আরো আপনভাবে মেলামেশা।

চমৎকার!

আর্মি অফিসারের পোশাকে, হাতে স্যাফরন কালারের আর্মডব্যাচ পরে এ-ডি-সি'র চাকরি করতে এসে বেশি কথাবার্তা বলতে পারে না ক্যাপ্টেন। বয়স তো হয়েছে, বুদ্ধি তো আছে, রক্তমাংসের মানুষের ইন্দ্রিয়ের জ্বালা তো অনুভব করতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে। সব কিছুই বুঝতে পারে, কিন্তু বলতে পারে না।

মণিকাকে বলতেও দ্বিধা হয়।

মণিকা বসে থাকতে থাকতেই মিস গুপ্তার টেলিফোন এসেছিল বলে ওর কথাই সে বার বার জানতে চায়, শুনতে চায়। মিস গুপ্তার মতো আরো কতজনেই তো ক্যাপ্টেনকে টেলিফোন করে, নানা সময় দেখা সাক্ষাৎ করে, হাসি-ঠাট্টা করে। তাদের কথা মণিকা জানে না ; তাই শুনতেও চায় না।

ক্যাপ্টেন কিছু বলতে পারে না। বলতে দ্বিধা হয়, লজ্জা হয়, ঘেন্না হয়।

বাংলাদেশের বাইরে বড় হয়েছে, উত্তর-পশ্চিমে চাকরি করেছে। তাইতো বাংলাদেশকে স্বর্গ মনে করত। গভর্নরের এ-ডি-সি হবার মোহ তার ছিল না কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে এত নিবিড় পরিচয় হবার সুযোগ পাবে বলেই এই চাকরি নিয়েছিল। মনে মনে অনেক শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে এসেছিল বাংলাদেশে। ক্যাপ্টেন ভাবত ডেভিড হেয়ার, মেকলে বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার করেছিলেন কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতের মতো পাশ্চত্যের নোংরামি এখানে পাত্তা পায়নি।

এ-ডি-সি-র চাকরি করতে এসে সব গোলমাল হয়ে গেল।

মণিকাকে অনেক অনুরোধ করেছিল, 'প্লিজ! ওদের কথা বলতে অনুরোধ করো না।'

'কেন বলো তো তুমি সব সময় ওদের কথা লুকোতে চেষ্টা করো?'

ক্যাপ্টেন মনে মনে ঠিক করল, না। আর লুকোবে না। সব কথা খুলে বলবে। হাজার হোক মণিকাকে নিয়ে ও ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখে। মনে হয় মণিকার মনেও টুকরো টুকরো স্বপ্ন জমতে শুরু করেছে। ঈশান কোণের কালো টুকরো মেঘের মতো ছোট-ছোট সন্দেহের কারণের মধ্যেও অনেক অশান্তির সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। রোগের জীবাণুর মতো সন্দেহের জীবাণুকেও নিপাত করতে হয়। তাছাড়া মণিকার কাছে লুকোবার কী আছে?

'বৃদ্ধ বর্মিজ অধ্যাপকের খবর নিতে গিয়ে তোমাকে দেখেই আমি চমকে উঠেছিলাম।'

'কেন?'

'ফ্লাওয়ার ভাস-এর ফুল দেখতেই অভ্যস্ত ছিলাম। তোমাকে দেখে মনে হয় যেন ভোরবেলার শিশির ভেজা চন্দ্রমল্লিকা। চমকে যাব না?' ক্যাপ্টেন যেন গর্বের সঙ্গে চাপা হাসি হাসতে হাসতে মণিকার দিকে তাকাল।

লম্বা লম্বা ভ্রু দুটোকে কুঁচকে উপরে টেনে মণিকা জানতে চাইল, 'তার মানে?'

'তার মানে তোমাকে দেখেই শুধু সুন্দরী নয়, পবিত্র মনে হয়েছিল।'

ক্যাপ্টেন বেশ সিরিয়াসলি বললেও মণিকা পাত্তা দিল না। 'তুমি কি ফ্ল্যাটারি শুরু করলে?'

'নট অ্যাট অল।'

'তবে।'

'তবে শোন।'

তারপর ক্যাপ্টেন ধীরে ধীরে শুরু করেছিল, 'দুটি অপরূপা সুন্দরী বা যুবকের মধ্যেও পার্থক্য থাকে।'

'থাকেই তো।'

'কিসের পার্থক্য?'

'অনেক কিছুরই পার্থক্য থাকতে পারে।'

'পার্থক্য থাকে শুধু মাধুর্যের। দেহ আর মনের সমন্বয়ে জন্ম নেয় মাধুর্য। দুটি মেয়ে সুন্দরী হতে পারে কিন্তু দুজনের মাধুর্য কিছুতেই সমান হতে পারে না।

মণিকা তখনও তর্ক করে, 'তা তো হবেই।'

'কেন বলো তো?'

মণিকা একটু থমকে দাঁড়ায়। দৃষ্টিটা সরিয়ে ঘুরিয়ে নেয় প্রায় নির্জন বোটানিকসের চারপাশ। হাঁটতে হাঁটতেই আনমনে দুটো একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে। বাতাসে এক গোছা চুল মুখের ওপর এসে পড়েছে। তাঁদের শাড়ির আঁচলটা খানিকটা বন্ধন মুক্ত করে উড়ে বেড়াচ্ছে।

ক্যাপ্টেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখে। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, সমুদ্র যেমন নদীকে আকর্ষণ করে ক্যাপ্টেনও মনে মনে তেমনি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করল।

মনে মনে বলল, মণিকা, যুগ যুগ আগে তুমিই বোধহয় হিমালয় দুহিতা পার্বতী ছিলে, তোমাকে দেখেই বোধহয় মহাদেবের...

মাথাটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মুখের ওপর পড়া চুলগুলো সরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে মণিকা ফিরে বলল, 'কিছু বলছ?'

ক্যাপ্টেন চমকে উঠে। 'না, না, কিছু বলছি না।'

'মনে হলো কি যেন বলছিলে।'

'কই না তো।'

'কিন্তু আমার যে মনে হলে তুমি বলছিলে।'

ক্যাপ্টেন হাসে। 'তুমি কি বলতো?'

'হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা করছ?'

'তুমি কেমন করে বুঝলে আমি কিছু বলছিলাম।'

'মনে হলো যেন তোমার কথা শুনতে পেলাম।'

ক্যাপ্টেন ভীষণ খুশি হলো কথাটা শুনে। আনন্দ খুশিতে সারা মুখটা জ্বল জ্বল করে উঠল। মণিকার দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার হাতটা দাও তো।'

মণিকা কোনো প্রশ্ন করল না, প্রতিবাদ করল না। হাতটা বাড়িয়ে দিল।

ক্যাপ্টেন মণিকার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ওকে একটু টানল। মণিকা হঠাৎ যেন বড় বেশি কাছে এলো।

ক্যাপ্টেন বলল, 'থ্যাঙ্কস, মেনি মেনি থ্যাঙ্কস মণিকা। আর আমার ভয় নেই।'

মণিকার ইরানি ঠোঁটের কোণায় একটু তৃপ্তির হাসির রেখা ফুটে উঠল।

'কি হলো?'

'কি হয়নি বলো?'

ক্যাপ্টেনের হাতের মুঠোয় তখনও মণিকার হাত। তখনও দুজনে দুজনকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে দেখছে। মণিকা একটি কথাও বলল না।

'সত্যি, মনে মনে তোমাকে অনেক কথা বলেছিলাম। ভাবতে পারিনি তুমি জানতে পারবে, বুঝতে পারবে।'

মণিকা দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়েছে। ক্যাপ্টেন প্রায় কানে কানে ফিস ফিস করে বলল, 'আমার মনের কথাও যখন শুনতে পাও তখন আর আমার ভয় নেই, চিন্তা নেই।'

ক্যাপ্টেন এবার আস্তে আস্তে হাতটা ছেড়ে দিয়ে আলতো করে ডান হাত দিয়ে ওকে একটু জড়িয়ে ধরে বলল, 'এবার তোমাকে সব কথা বলব। কিছুই 'লুকাব না।'

আনত নয়নেই মণিকা প্রশ্ন করে, 'কথা দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'শুধু রূপ নয়। রূপসী অনেকেই। শ্যামলীও। কিন্তু লাবণ্য? সবার থাকে না। গন্ধ-স্পর্শ-রূপলাবণ্য সব নিয়েই ভালো লাগা। ফুলের মতো মানুষেরও রূপ-লাবণ্যই শেষ কথা নয়। সৌরভই বড় কথা। মানুষেরও সৌরভ আছে, গন্ধ আছে। যে মেয়েদের সে সৌরভ নেই, মিষ্টি গন্ধ নেই, তাদের রূপ-লাবণ্যের কি মূল্য?'

মণিকা কিছুতেই এসব বিশ্বাস করত না। তর্ক করত।

'আমি কি গোলাপ যে আমার গন্ধ থাকবে, সৌরভ থাকবে?'

'প্রত্যেক মানুষেরই দেহের একটা গন্ধ আছে...'

'গন্ধ আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে। প্রতিটি অঙ্গের একটা গন্ধ আছে। সব অঙ্গের গন্ধ মিলিয়েই দেশের গন্ধ...'

আবার মাঝপথে বাধা দেয় মণিকা। 'কই আমি তো আমার দেহের কোনো গন্ধ পাই না।'

'পাবে না। তুমি তোমার দেহের গন্ধের সঙ্গে এত বেশি পরিচিত যে তা অনুভব করা সম্ভব নয়, কিন্তু তুমি তোমার মাকে কাছে একটু টেনে নিও, একটু জড়িয়ে ধরো, একটা অতি পরিচিত সুন্দর গন্ধ পাবে।'

ক্যাপ্টেন একটু যেন সরে বসে। মুখটা মণিকার কানের কাছে নিয়ে একটু ফিস ফিস করে বলে, 'আমার দেহের গন্ধ পাচ্ছ!'

মণিকা হাসতে হাসতেই ভ্রূ কুঁচকে বলে, 'আঃ কি যা তা বলছ?'

আর একদিন মধ্যমগ্রামের ফার্মে গিয়ে ক্যাপ্টেন আরো অনেক কথা বলেছিল।

'একটা ছোট্ট বাচ্চাকে কোলে তুলে নিও। একটা সুন্দর মিষ্টি গন্ধ পাবে...'

ফার্মের মধ্যে ছোট্ট রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মণিকা জবাব দেয়, 'বাচ্চাদের গন্ধ থাকে বলে কি বুড়োদেরও থাকবে?'

'একশো বার থাকবে। দেহ, মন, বয়স ও চরিত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গন্ধ বদলায়।'

মণিকা তর্ক করে না কিন্তু ক্যাপ্টেনের যুক্তি মেনে নেয় বলেও মনে হয় না।

পরে ওই ছোট্ট কটেজের বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে ক্যাপ্টেন বলেছিল, 'শ্যামলীর রূপ আছে, যৌবন আছে, কিন্তু লাবণ্য নেই। প্রথমদিন তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোমার লাবণ্য আর সৌরভে মুগ্ধ হয়েছিলাম।'

মণিকা ডান হাতে চায়ের কাপ ধরে থাকল কিন্তু বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, 'কচু!'

ক্যাপ্টেন মুচকি হেসেছিল। মনে মনে বলেছিল, কিভাবে তোমাকে এসব কথা বোঝাই বলতো? দেহমনের অপব্যবহার হলে রূপ থাকতে পারে কিন্তু লাবণ্য-সৌরভ নষ্ট হয়ে যাবেই।

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ওই মুচকি হাসতে হাসতেই বলেছিল, 'শ্যামলীর রূপ-যৌবনের চাইতে তোমার লাবণ্য-সৌরভ অনেক বেশি লোভনীয়।'

'আঃ কি অসভ্যতা করছ? বোঝাবার ক্ষমতা নেই, শুধু অসভ্যতা করতে পারো।'

সামনের চেয়ারে বসে ক্যাপ্টেন একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বলে, 'বিয়ের আগে এর চাইতে বেশি বোঝান যায় না। বুঝলে?'

মণিকা তিড়িং করে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তোমার মতো অসভ্য আর্মি অফিসারকে বাংলাদেশের মেয়ে বিয়ে করবে?'

মেয়েরা অনেক কথাই এড়িয়ে যায়, স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করে কিন্তু তাই বলে মনে মনে অনুভব করে না, তা নয়। বাড়ি ফিরে গিয়েও বার বার মনে পড়েছিল ক্যাপ্টেনের কথা।

মনে মনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করেছিল।

কলেজে রোজ অর্পিতার পাশে বসত কিন্তু যেদিন অর্পিতা না আসত সেদিন লিলির পাশে ওকে বসতে হতো, সেদিন কি বিশ্রী লাগত! কেন অধ্যাপক মণ্ডের ছেলে? 'জান সিস্টার, বাড়িতে ঢুকেই আমি বুঝতে পারি তুমি আছ কি নেই।'

মণিকা জানতে চাইত, 'কেমন করে?'

'মেয়েদের একটু ফ্লেবার আছে। মা-মারা যাবার পর সে গন্ধ আর পেতাম না। কিন্তু তুমি আসা-যাওয়া শুরু করার পর আবার যেন সেই হারিয়ে যাওয়া গন্ধটা খুঁজে পাচ্ছি।'

তবে কি ক্যাপ্টেনের কথাই ঠিক? উপরের ঘরে একলা শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে দূরের আকাশ দেখতে দেখতে কতবার ভাবছিল এইসব কথা। পাশ ফিরল। ও পাশের ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজেকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। নিজের সৌরভে যেন নিজেই মাতাল হলো।

শুধু সে রাত্রে নয়, পরের কয়েকটা দিন নিজেকে নিয়েই মেতে রইল মণিকা। একটু একলা থাকলেই বড় বেশি নিজেকে দেখে। আপাদ-মস্তক দেখে। সর্বাঙ্গ দেখে। ওর লাবণ্য আছে? সৌরভ আছে?

আছে বৈকি! তা নইলে রাজভবনের আকর্ষণ তুচ্ছ করে ক্যাপ্টেন ছুটে আসে? হাই সোসাইটিতে একটু মর্যাদা পাবার জন্য কলকাতার কত মেয়ে এ-ডি-সি-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। ক্যাপ্টেনের সঙ্গেও তো কত মেয়ের আলাপ। তবুও যখন—

ক্যাপ্টেনকে যেন আরো ভালো লাগে। বড় বেশি ভালো লাগে। কৃতজ্ঞতায় সারা মনটা ভরে যায়। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। শুধু দেখতে? সামান্য একটু আদর করতে, একটু ভালোবাসতে। একটা গান শোনাতেও ইচ্ছে করছে।

গভর্নরের ওপর ভীষণ রাগ হয় মণিকার। এত ট্যুরে যাবার কোনো অর্থ হয়?—প্রতি মাসেই ট্যুর? যেন ক্যানভাসার, হেড অফিসে বেশিদিন থাকার হুকুম নেই। আচ্ছা ট্যুরে যাবে যাও, বক্তৃতা দিতে ভালো লাগে, দাও। তাই বলে সব সময় ক্যাপ্টেন রায়কে কেন? আর কি কোনো এ-ডি-সি নেই? আচ্ছা ও যদি ম্যারেড হতো? ছেলে-মেয়ে থাকত?

ছি, ছি। এমন করে একজন ইয়ংম্যানের লাইফ্ নষ্ট করে?

কলকাতা থেকে বর্ধমান-বাঁকুড়া-বীরভূম ঘুরে আসতে কতদিন লাগে? একদিন-দুদিনই তো যথেষ্ট! সাতদিন ধরে ঘুরে বেড়াবার কোনো অর্থ হয়? বর্ধমান পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে গভর্নরের যাবার কি দরকার? দেশে কি কোনো শিক্ষাব্রতী নেই? ভি-আই-পি চাই? ভালো কথা? ভাইস চ্যান্সেলার বা এডুকেশন মিনিস্টার তো আছেন। আরো বড় ভি-আই-পি? কেন চীফ মিনিস্টার? তাঁর তো কাজ আছে, লাটসাহেবের মতো বক্তৃতা দিলেই চলবে না!

বর্ধমান পাবলিক লাইব্রেরিতে যাবার তবু অর্থ হয় কিন্তু দুর্গাপুরে? লাটসাহেব কি ইঞ্জিনিয়ার? কলকারখানা দেখে উনি কি বুঝবেন? বুঝি আর না বুঝি তবুও যেতে হবে। লেকিন, মাগার করে বক্তৃতা দিতে দিতে ওয়ার্কারদের বলতে হবে দেশের ফয়দার জন্য আরো পরিশ্রম করতে হবে, আরো ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। না জানি দেশের ফয়দার জন্য লাটসাহেব নিজে কত খাটছেন, কত ত্যাগ স্বীকার করছেন।

মেজাজ গরম হয়ে যায় মণিকার।

দুর্গাপুর থেকেও ফিরবেন না। রামপুরহাটে সিল্ক উইভার্স কোঅপারেটিভেও যেতে হবে। কেন? দুচার গজ সিল্কের কাপড় প্রেজেন্ট পাবেন বলে?

গভর্নরের ওপর যত রাগ হয়, ক্যাপ্টেনকে তত বেশি ভালো লাগে, তত বেশি কাছে পেতে ইচ্ছা করে।

জানালা দিয়ে দূরের আকাশের তারাগুলো দেখে। চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে আসে। তবুও মনে হয় ওরা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

রাতের তারা মিলিয়ে যায় ভোরের আকাশে। কিন্তু রাতের স্বপ্ন? সে তো মিলিয়ে যায় না, হারিয়ে যায় না।

ঘুমের ঘোরেই মণিকা বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করে, হাতটা যেন কাকে খুঁজছে।

সারাদিনই খোঁজে। দৃষ্টিটা চলে যায় কতদূরে, এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন রায়ের কাছে।

মাকে ধরা দেয় না, কিন্তু নিজের কাছে? প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ে। ধরা পড়ে সকালে, দুপুরে। সন্ধ্যায়, রাত্রে।

নীচের থেকে বাবার গলার আওয়াজ শুনতে পায়, 'হ্যাঁগো, খুকু কোথাও বেরিয়েছে নাকি?'

শুয়ে শুয়েই টাইমপিসটা দেখে। ছি, ছি! এত বেলা পর্যন্ত শুয়ে আছে? তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। সারা রাত্তিরের স্বপ্ন বিধ্বস্ত চোখেমুখে একটু জল দিয়ে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। ঢিলেঢালা জামাকাপড় ঠিক করে নেয়। তারপর ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে চিরুনিটা তুলতে গিয়েই থমকে যায়।

...কদিন তোমার চিন্তায় চিন্তায় কি হয়েছি বলো তো! এবার ট্যুর থেকে ফিরে এসো। মজা দেখাব। তোমার জন্য কী বেইজ্জত হচ্ছি দেখছ? সাড়ে আটটা বাজে, এখনও আমি নীচে নামিনি।...

মাথার ওপর দিয়ে কোনোমতে চিরুনিটা বুলিয়ে নিয়ে দুহাত দিয়ে খোঁপা করে নেয়। হুড়মুড় করে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে।

সিঁড়ির মুখেই মা-র সঙ্গে দেখা। 'কাল কত রাত্তির অবধি নভেল টভেল পড়লি?'

মণিকা মুহূর্তের জন্যে ভাবে। এই বিপদে লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার জন্য এমন বুদ্ধি দেবার জন্য ভীষণ ভালো লাগে মা-কে। জড়িয়ে ধরে মা-কে। 'কি করে বুঝলে বলতো মা?'

'তুই মা হলে তুইও বুঝবি।'

মণিকা আর দাঁড়ায় না মা-র সামনে, চলে যায় বাবার স্টাডিতে।

'তুমি আমাকে ডাকছিলে বাবা?'

হাতের বইটা নামিয়ে রেখে ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, 'না ডাকছিলাম না। তবে আজ তুই চা দিতে এলি না দেখে খোঁজ করছিলাম।'

'কাল শুতে শুতে একটু রাত হয়েছিল বলে আজ উঠতে বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

মণিকা বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওর বাবা ডাক দিলেন, 'হ্যাঁরে তোর মনে আছে তো আজ বলাই-এর ওখানে যেতে হবে?'

মাথাটা ঘুরিয়ে পিছন ফিরতে গিয়ে আলতো করে বাঁধা খোঁপাটা খুলে গেল। মুখে কিছু বলল না, ভ্রু কুঁচকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'কিরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে? ভুলে গিয়েছিলি বুঝি?'

'হ্যাঁ, ঠিক মনে ছিল না।'

মণিকা চলে যায়। একটু দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে আস্তে আস্তে ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায়।

দ্বিধা হবে না?

ডক্টর ব্যানার্জি বলাই বলতে অজ্ঞান। একে বাল্যবন্ধুর ছোট ভাই, তারপর নিজের প্রিয় ছাত্র। সেবার হাই ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল একমাত্র ওই। তাছাড়া সে কৃতী, সে সাকসেসফুল। ডক্টর ব্যানার্জির দুর্বলতা থাকার কারণ আছে বৈকি!

নিজের ঘরে চুপ করে বসে থাকতে থাকতেই মণিকা ভাবে, বাবার জন্য মা-ও বলাই-বলাই করে অস্থির। তাছাড়া মাসিমা-মাসিমা করে ন্যাকামি করে যে!

একটা ফ্রেঞ্চ কনস্ট্রাকশন ফার্মের রিজিওন্যাল রিপ্রেজেনটেটিভকে নিয়ে এত মাতামাতি করার কি আছে? না হয় হাজার হাজার টাকা রোজগারই করেন! ঘন ঘন বিদেশ গেলেই কি মাথা কিনে নিয়েছে?

সব কথা মা-বাবাকে বলা যায় না। মণিকাও বলেনি কিন্তু তাই বলে তো সে কথা ভুলে যায়নি।

কলকাতায় হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করছে। বাবা-মা রেঙ্গুনে। হঠাৎ একদিন বিকেলবেলা ভিজিটিং আওয়ার্সে জামা-কাপড়, খাবার-দাবারের কয়েকটা প্যাকেট নিয়ে কৃতী বলাই হাজির হলো মণিকার হোস্টেলে। মণিকা প্রথমে চিনতে পারেনি।

বলাই বুঝতে পারল। কি চিনতে পারছো?'

একটু লজ্জিত হয়ে মণিকা বলল, 'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'আমি বলাইদা। তোমার বাবার ছাত্র। এবার মনে পড়েছে?'

মনে পড়বে না? বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু কানাইবাবু। ওর রাঙা জেঠু। একে তাঁর ছোট ভাই, তারপর বাবার প্রিয় ছাত্র।

খুশিতে মণিকা হাসে। 'আপনি বলাইদা?'

'হ্যাঁ।'

বারান্দায় দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল।

'চলুন ভিজিটার্স রুমে গিয়ে বসি।'

উত্তর দেবার আগেই হাতের ঘড়িটা দেখল। ওদিকে তাকিয়ে ইসরায় ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে বলল।

'না, আজ আর বসব না। আমি আজকাল প্রায়ই রেঙ্গুনে যাতায়াত করি আর সময় পেলেই তোমার বাবার কাছে চলে যাই। মাসিমা এগুলো তোমার জন্য পাঠিয়েছেন...'

'একটু তো বসবেন?'

বলাই আদর করে মণিকার গালে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, 'না, না আজ আর বসব না।'

কোটের পকেটে হাত দিয়ে দুটো চিঠি বের করে মণিকার হাতে দিল, 'এই চিঠি দুটো রাখো। একটা তোমার আরেকটা তোমার হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের।'

'এক কাপ চাও খাবেন না?'

এবার স্নেহের শাসন। 'তুমি ছোট হয়ে আমাকে কি খাওয়াবে, আমি তোমাকে খাওয়াব।'

সেদিন বলাইদা আর অপেক্ষা করল না। চলে গেল।

বলাইয়ের গাড়িটা গেট দিয়ে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওই দিকেই চেয়ে রইল মণিকা।

বেশ লাগল। হাসি-খুশি-প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা একটা সার্থক মানুষ মনে হলো বলাইদাকে।

ডক্টর ব্যানার্জি হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্টকে জানিয়েছিলেন যে আমার বাল্যবন্ধু ও মণিকার লোক্যাল গার্ডিয়ান প্রফেসর কানাই সরকারের অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাই ও আমার ছাত্র বলাই সরকার মণিকাকে দেখাশুনা করবে।

রাঙা জেঠু তখন প্রায়ই কলকাতার বাইরে যেতেন। ছোটখাটো নানা কারণে মণিকার বেশ অসুবিধাই হতো। দু-একদিনের ছুটি পেলেও রাঙা জেঠুর চিঠির অভাবে চুঁচুড়ায় ছোট মাসির কাছে যেতে পারত না। তাইতো বাবার চিঠিটা পেয়ে মণিকা খুশি হয়েছিল।

বলাই মাসে দু-একদিন কয়েক মিনিটের জন্য মণিকাকে দেখে যেত। সব সময়ই কিছু না কিছু প্রেজেন্টেশন, খাবার-দাবার নিয়ে আসত। কদাচিৎ কখনও সময় থাকলে একটু আধটু গল্পগুজব করত দুজনে। কখনও কখনও আরো দুচারজন মেয়ে ঘিরে বসত, গল্প করত।

বলাই ব্যাংককে বদলি হবার আগে মণিকা বলেছিল, 'আপনি চলে যাবার আগে আমাকে একবার চুঁচুড়া ঘুরিয়ে দেবেন।'

একটা ছুটির দিনে সকালে বলাই নিজেই গাড়ি নিয়ে হাজির হলো মণিকার হোস্টেলে। একদিনের ছুটিতে মণিকা চললো মাসির বাড়ি। বলাইদার গাড়িতে চড়ে চুঁচুড়া যেতে মণিকার সে কি আনন্দ!

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে যাবার সময় বলাই জিজ্ঞাসা করল, 'সোজা মাসির বাড়িই যাবে?'

'কেন আপনি অন্য কোথাও যাবেন?'

স্টিয়ারিং ডান হাতে ধরে বাঁ হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিতে নিতে জবাব দেয় বলাই, 'তুমি চাও তো খানিকটা ঘুরে আসতে পারি।'

ছুটির দিনে এমন মুক্তির আনন্দের আমন্ত্রণ পেয়ে মণিকা মনে মনে চঞ্চল হয়, উত্তেজিত হয়। অথচ...

'কোথায় যেতে চান?'

'আমি তো ফুরসৎ পেলেই হাজারিবাগ চলে যাই।'

'হাজারিবাগ?'

'সিঁথির মোড় ছাড়িয়ে টবিন রোডের মোড় পার হলো।'

'হাজারিবাগ বলে চমকে ওঠার কি আছে? দরকার হলে একদিনেই ঘুরে আসা যায়।'

'একদিনেই?'

'নিশ্চয়ই।'

ডানলপ ব্রিজের কাছে বলাই স্টিয়ারিং ঘোরাল। ট্রেন লাইন ধরে গাড়ি চললো দক্ষিণেশ্বর-বালি ব্রিজের দিকে।

একবার মনে হলো ঘুরেই আসে হাজারিবাগ। বেশ মজা হবে। আবার ভাবে, না, না। একলা একলা বলাইদার সঙ্গে যাওয়া কি ঠিক হবে?

গাড়ি বালি ব্রিজে। গঙ্গার হাওয়ায় চুলগুলো উড়ে উড়ে মণিকার মুখে পড়ছে। আঁচলটাও উড়ছে। বলাই একবার দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে দেখে নেয়।

শেষ পর্যন্ত চুঁচুড়া ঘুরেই এলো। তবুও বেশ ভালো লাগল। কলেজ-হোস্টেলের নিয়মতন্ত্রের বাইরে এই একদিনের মুক্তির আনন্দ যেন ভোলা যায় না।

বলাই সিঙ্গাপুর বদলি হবার পরও মনে পড়ত। মাঝে মাঝে। কখনও কখনও। কলেজের ঘণ্টা, হোস্টেলের ঘণ্টা, আর ওই উঁচু লোহার গেটটার মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রাখতে রাখতে

হাঁপিয়ে উঠলেই মনে পড়ত।

উপরের ঘরে চুপ করে বসে বসে সেসব কথা মনে পড়ছিল মণিকার। হাঁটুর পর কনুই রেখে হাতের পর মুখ দিয়ে কিছুটা উদাস হয়ে ভাবছিল।

রাতের স্বপ্ন চোখে নিয়েই ঘুম থেকে উঠেছিল। বেশ লাগছিল। আলাপের পর রাগ শুরু হবার মুখেই সেতার থেমে গেলে যেমন বিরক্ত লাগে, ঠিক তেমনি অস্বস্তিবোধ করছিল মনে মনে।

শুধু চুঁচুড়া ঘুরেই যদি সব শেষ হতো তাহলে হয়তো এমন বিচ্ছিরি লাগত না। বি-এ পরীক্ষা দিয়ে রেঙ্গুনে যাবার পর যদি...

ভারতেও খারাপ লাগে মণিকার। বার বার সরিয়ে দেয় টুকরো টুকরো চিন্তার মেঘগুলো। আকাশটা একটু পরিষ্কার হলেই দেখতে পায় ক্যাপ্টেনকে কিন্তু সঙ্গেই সঙ্গেই আবার কোথা দিয়ে যে ওই স্মৃতি বোঝাই মেঘগুলো হাজির হয় তা মণিকা বুঝতে পারে না।

তাছাড়া ভীষণ অস্বস্তিবোধ করছে। ক্যাপ্টেনকে নিয়ে মনে মনে অনেকদূর এগিয়েছে। ভবিষ্যতের ছবিটাও মোটামুটি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ঠিক এমন সময় মনটা বিক্ষিপ্ত হবে, ভাবতে পারেনি।

উপর থেকে নীচে নেমে এলো। এঘর-ওঘর ঘোরাঘুরি করল। খবরের কাগজটা একবার হাতে তুলে নিয়ে চোখ বুলিয়েই নামিয়ে রাখল। এমন বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে কাগজ পড়া যায়?

সিঁড়ি দিয়ে দু-এক ধাপ উপরে উঠতেই মা পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে তুই বাথরুমে-টাথরুমে যাবি না? কখন জলখাবার খাবি?'

মণিকা পিছন ফিরে বলল, 'শরীরটা যেন কেমন করছে। এক্ষুনি কিছু খাব না।'

'কিছু ঔষধপত্র খাবি?'

'না, না। একটু শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

উপরে নিজের ঘরে সত্যি মণিকা শুয়ে পড়ল। এই সকালবেলাতেই দিনের শেষের ক্লান্তি আর অবসাদ যেন ওকে ঘিরে ধরল।

...রেঙ্গুন। ইউনিভার্সিটির পাশেই ইউনিভার্সিটি এভিনিউ ও প্রোম রোডের প্রায় কোণাতেই ডক্টর ব্যানার্জির কোয়ার্টার। কলকাতা থেকে এসে ভীষণ ভালো লাগল এই কোয়ার্টারকে। চার পাঁচখানি বড় বড় ঘর। তাছাড়া প্যাগোডার মতো একটা ছোট্ট আউট হাউস ধরনের আরেকটা ঘর সামনের লনের এক কোণায়। পিছনের দিকটা আরও চমৎকার। গাছপালা লতাপাতা। একটা ছোট্ট বটানিকস্।

বাড়িতে ঢুকে এক মিনিট বসল না, মুখে একটু জল পর্যন্ত দিল না। প্রায় ঘণ্টখানেক ধরে শুধু বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখল!

'মা, তুমি যে এখানে এসে একেবারে সিজনড্ ইন্টিরিয়র ডেকরেটর হয়ে গেছ দেখছি।'

মিসেস ব্যানার্জি মুচকি হাসেন। 'আমি কিচ্ছু করিনি। প্রায় সারা বাড়িটাই বলাই সাজিয়ে দিয়েছে।'

প্রথমটা শুনে চমকে উঠেছিল মণিকা। বলাইদা রেঙ্গুনে?

উপরের ঘরে চুপটি করে শুয়ে শুয়ে মনে করছিল সেসব স্মৃতি। প্রথম কিছুদিনের মিষ্টি স্মৃতি। হৈ হৈ করার কথা! উঃ! কি ঘুরেই বেড়িয়েছে। সারা শহরটাকে চষে খেয়েছে দুজনে। তারপর গেছে রয়্যাল লেকের ওরিয়েন্ট ক্লাবে।

সাপুড়ের মতো শুধু বাঁশি বাজিয়েই চলেছিল বলাই। আর যেন কোনো অভিসন্ধি ছিল

না ওর। ছেলেদের মতো সারা পুকুর জুড়ে জাল ফেলেছে, বুঝতে দেয়নি শিকারের পরিকল্পনা। অনেক পরে ধীরে ধীরে জাল গুটিয়ে এনেছে। সাপুড়ের মিষ্টি বাঁশি আর শোনা যাচ্ছিল না। থেমে গেছে। শিকার যে হাতের মুঠোয়। তখন আর বেরুবার পথ নেই, পালাবার উপায় নেই।

সকালেই বেরিয়েছে মণিকাকে পেগু দেখিয়ে আনবে বলে। বিকেলেই ফিরবে! প্রোম রোড দিয়ে এসে মন্টগুমারি স্ট্রিট পার হয়ে বলাই নিজের বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল।

'চল একটু নামি।'

'কেন?'

'একটু কিছু খেয়ে নেব!'

'সে কি? আপনি ব্রেকফাস্ট করেননি?'

'না।'

মণিকা একটু রাগারাগি করলেও শেষ পর্যন্ত উপরে গেল।

অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। ভিতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করল।

মণিকাকে ভিতরের স্টাডিতে নিয়ে বলল, 'একটু বসো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভিতর থেকে কতকগুলো বিরাট বিরাট প্যাকেট নিয়ে এলো। 'এই নাও এগুলো তোমার।'

'তার মানে?'

আবার তর্ক। আবার কথা কাটাকাটি। শেষ পর্যন্ত খুলল।

কপালে হাত ঠেকিয়ে মণিকা বললে, 'মাই গড! করেছেন কি?'

'আবার তর্ক করছ? এই জাপানিজ সিল্কের শাড়িটা পরবে?'

'না, না। এখন নতুন শাড়ি পরব কেন?'

'আবার কেন? সব কেন-র কি কারণ থাকে?'

'হাউ ডু ইউ লাইক দিস কিমানো?'

মণিকা আর জবাব দেয় না। শুধু বিস্ময়ে চেয়ে থাকে বলাই-এর দিকে।

'একটা অনুরোধ রাখবে?'

'বলুন'।

'আগে বলো রাখবে কিনা?'

'পারলে নিশ্চয়ই রাখব।'

'না পারার মতো কিছু বলব না।'

'তাহলে নিশ্চয় রাখব।'

'কথা দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে ছুঁয়ে বলো।'

মণিকা হেসে ফেলে। 'কি ছেলেমানুষি করছেন।'

মণিকা ওর গায়ে হাত দিতেই বলাই ওই হাত ধরে টেনে নিল, 'লক্ষ্মীটি এই কিমানোটা পর।'

অবাক-বিস্ময়ে হাসিতে-খুশিতে ভ্রু-দুটো টেনে উপরে তুলে মণিকা বলল, 'এই কিমানোটা পরব।'

'হ্যাঁ।'

'আমি তো কিমানো পরতে জানি না।'

উপরের ঘরে শুয়ে শুয়ে সব ভাবছিল। পাশ ফিরে শুয়ে ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে মনে মনে কত প্রশ্ন আসে। কত কথা আসে। কত ভাবনা আসে।

বিছানা ছেড়ে ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসল। অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে দেখল। সেদিন কিমানো পরাতে গিয়ে বলাইদা যে হঠাৎ পাগলামি করেছিল, আমার জীবন বসন্তের যে মধু...

না, না। আর ভাবতে চায় না মণিকা। কিন্তু ভয় করে। ধরা পড়বে না তো ক্যাপ্টেনের কাছে? স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হবে না তো?

সেই একটা দিনের স্মৃতি যখন মনে পড়ে, মণিকা শিউরে ওঠে। একটা দিন কোথায়? কয়েক ঘণ্টা! না তাও না। বড় জোর আধ ঘণ্টা। বরং পনের-বিশ কি পঁচিশ মিনিটই হবে। কিন্তু ওই কয়েকটা মিনিটেই জীবনের বনিয়াদ ধরে টান পড়েছিল। ঝড় বৃষ্টি বা সাইক্লোন নয়। ভূমিকম্প। পলকেই সবকিছু। দীর্ঘদিনের সাধনায়, অনন্ত পরিশ্রম করে যে সৌধ সৃষ্টি হয়, প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা যাকে স্পর্শ করতে পারে না, সেই তারও জীবনসঙ্কট উপস্থিত হয় ওই কয়েকটি মুহূর্তের ভূমিকম্পে।

সেদিনের ওই কয়েকটা মিনিটেই মণিকার জীবন নাট্যে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করল। এতে অভিনবত্ব কিছু নেই। এই পৃথিবীতে কোটি-কোটি বলাইদা ছড়িয়ে আছে। শিক্ষাদীক্ষা আচার আদর্শের পিছনে লুকিয়ে থাকে ইন্দ্রিয়। লোলুপ ইন্দ্রিয়। শিকারি ইন্দ্রিয়। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে ওদের ওই লোলুপ ইন্দ্রিয়ের কাছে বলিদান যাচ্ছে কত মণিকার যক্ষের ধন। কোনো না কোনো বলাইয়ের হাতে তিলে তিলে সঞ্চিত যক্ষের ধন হারাতেই হয়। কিন্তু তার পরিবেশ আছে, মানসিক প্রস্তুতি আছে। যেখানে সে প্রস্তুতি নেই, সহজ সরল স্বাভাবিক পরিবেশ নেই, নেই সামাজিক স্বীকৃতি, সেখানেই দ্বিধা, সঙ্কোচ। মনের মধ্যে কত প্রশ্ন আসে যায়। যে চাওয়া, যে পাওয়ার মধ্যে পরিপূর্ণ তার সৌন্দর্য নেই, সৃষ্টির আনন্দ নেই, যে স্ফুলিঙ্গ কল্যাণ দীপশিখা জ্বালায় না কিন্তু সারা জীবন মনকে তিলে তিলে দগ্ধ করে—মণিকা তা ভুলবে কেমন করে?

তাছাড়া বলাইদা কেমন শঠতা করে, চতুরতার সঙ্গে...

মণিকা রাগে জ্বলে ওঠে। না, কিছুতেই ওর ওখানে নেমন্তন্ন খেতে যাবে না। বাবা-মা বললেও না। কোনো অছিলায় এড়িয়ে যাবে।

মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন নিঃসঙ্গ বোধ করে মণিকা। নাকি অসহায়! ওই মুহূর্তের জন্যই।

ক্যাপ্টেনের নির্ভর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের কথা মনে পড়ে। কতদিন ঘুরে বেড়িয়েছে ওর সঙ্গে। কত জায়গায়। কত বিচিত্র পরিবেশে। সকাল, সন্ধ্যায়। কখনও বা রাত্রে। কলকাতায়, উপকণ্ঠে। গ্র্যান্ড, গ্রেট ইস্টার্ন, ব্লুফক্স, বা ক্যালকাটা ক্লাবে, ফোর্ট উইলিয়ামের অফিসার্স মেসে। লাঞ্চ, ডিনার ককটেল ক্যাবারেতেও। রাজভবনের ঘরে একা একা কাটিয়েছে সারা দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা। কিন্তু কই, কোনো দিনের জন্যও বলাইয়ের মতো কোনো সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে ওর যৌবন দুর্গ আক্রমণ করেনি? দখল করতে চায়নি! বড় জোর হাতটা চেপে ধরে মুখের কাছে এগিয়ে এনে ফিস ফিস করে বলেছে, 'এই ধূসর জীবনের গোধূলিতে আর কতদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব?'

নয়তো বলত, 'জানত, Waiting is the hardest time of all.'

মণিকা বলত, 'Everything comes to those who can wait.'

ক্যাপ্টেন হাতটা আর একটু চেপে ধরে বলেছে, 'সেই ছবি দোলা খায় রক্তের হিল্লোলে, সে ছবি মিশে যায় নির্ঝর—কল্লোলে...'

সুরের দোলা মণিকার মনেও ঝঙ্কার দেয়। হাঁটু মুড়ে বসে হাঁটুর পর মুখ রেখে একটু হাসে।

একবার দেখে নেয় ক্যাপ্টেনকে। চোখের কোণায় স্বপ্নের বিদ্যুৎ-স্পর্শ।

ক্যাপ্টেন বলে, 'উত্তর দিতে পারছ না তো?'

'সত্যি উত্তর চাও?'

'নিশ্চয়ই।'

মণিকা একটু ভাবে। একটু ডুব দেয়। হয়তো একটু অনুভব করে 'তবে শোন—'

'ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই,'

যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই।

কোথা সে যে আছে সঙ্গোপনে

প্রতিদিন শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে।'

আরো কত কি হতো! কিন্তু ও তো কোনোদিন কোনো অন্যায় দাবি করেনি।

অন্যায়?

মাঝে মাঝেই মনে হতো ক্যাপ্টেন অপূর্ণতার বেদনায় বড়ই পীড়িত। মণিকারই খারাপ লাগত। কখনও কখনও মনে হতো, সব কিছু উজার করে ক্যাপ্টেনকে সুখী করে, পরিপূর্ণ করে, পরিতৃপ্ত করে।

পারত না। মনের ইচ্ছা মনেই থাকত। প্রকাশ করত না। তবুও দ্বন্দ্ব দেখা দিত মনের মধ্যে। কেন নিজের দাবিতে এগিয়ে আসতে পারে না? যেদিন সে দাবি নিয়ে এগিয়ে আসবে : আমাকে আমন্ত্রণ জানাবে, আমাকে প্রাণের মধ্যে টেনে নেবে, সেদিন তো আমি বাধা দেব না, আপত্তি করব না। বরং ওর ঐশ্বর্যে নিজেকেও...

দূরের শূন্য আকাশের দিকে চেয়ে আরো কত কি ভাবে মণিকা।

এক্ষুনি যদি ওকে পেতাম তাহলে হয়তো আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতাম না। বাবা-মাকে বলতাম...

সত্যই কি বলতে পারতাম?

কেন বলব না? অন্যায় কিছু নয়।

সম্ভব হলে আজই সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে লাল টকটকে বেনারসি পরে যেতাম ওই ব্রিলিয়ান্ট বলাইয়ের...

বহু অসম্ভবের মতো এটাও সম্ভব হলো না মণিকার। তবে নিজে গেল না। বাবা-মাকে বললে শরীরটা খারাপ।

ডক্টর ব্যানার্জি দু-একবার বললেন। 'তুই বাড়িতে শুয়ে থাকবি আর আমরা নেমন্তন্ন খেতে যাব?'

'তাতে কি হয়েছে? আমি কি কোনোদিন নেমন্তন্ন খাইনি?'

'কিন্তু ও তোর কথা বার বার করে বলেছিল।'

এ-কথার কি জবাব দেবে মণিকা। মনে মনে ভাবল, বার বার করে, বলবে না? কিমানো পরাবার স্মৃতি কি ভুলতে পারে? তাছাড়া হয়তো নতুন করে...

মা বললেন, 'থাক থাক। ও বরং নাই গেল। আজ সকাল থেকেই ওর শরীরটা ঠিক নেই।'

ওঁরা চলে গেলেন। মণিকা ডক্টরের স্টাডিতে গিয়ে বসল। চাকরটা ঘরদোর ঠিক করতে ভিতরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে চাকরটা এসে একটু ছুটি চাইল। 'দিদিমণি, আমি একটু ঘুরে আসব?'

হাতের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললে, 'যা। তাড়াতাড়ি আসিস।'

'দরজাটা আটকে দেবেন।'

'দিচ্ছি।'

একটু পরে দরজাটা বন্ধ করে আসতে আসতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

'কি হলো তুমি এলে না?'

'না।'

'শরীর খারাপ?'

'হ্যাঁ।'

'একটু ঘুরে গেলে মন ভালো লাগত না?'

'না।'

'বাড়িতে একলা একলা...'

'খুব ভালো লাগছে।'

'আমি তোমাকে নিয়ে আসব?'

'কেন টোকিও থেকে আবার নতুন কিমানো এনেছেন নাকি?'

আর নয়। সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার নামিয়ে রাখল মণিকা।

টেলিফোন রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেও মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না ; দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না সেই স্মৃতি। সেই কয়েকটি মুহূর্তের বিন্দু বিন্দু অনুভবের টুকরো টুকরো স্মৃতি। অন্যায় হলেও অবিস্মরণীয়। রিসিভার নামিয়ে রাখলেই কি সেসব ভুলা যায়!

কত প্রশ্ন, পাল্টা প্রশ্ন আসে মনে। সে কথা সবাই জানে, যার সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, লজ্জা-ঘৃণার অনুভূতি আর পাঁচজনে ভাগ করে নেয়, তার জন্য বেশি চিন্তা করতে হয় না। কিন্তু যে কথা যে কাহিনি, যে ইতিহাস বাইরের দুনিয়ার কেউ জানে না, যে আনন্দ বেদনার ভাগ অপরকে দেওয়া যায় না, তা যেন কিছুতেই ভুলা যায় না।

সন্ধ্যায় অন্ধকারটা একটু গাঢ় হলো। শূন্য বাড়িটায় নিঃসঙ্গ মণিকার মনও যেন অন্ধকারে ভরে গেল। চেয়ারে বসে টেবিলে পা দুটো তুলে দিয়ে হাতে পেন্সিল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই একবার নিজেকে দেখে। ভালো করে দেখে।

হঠাৎ 'বেল' বেজে উঠল। চারকটা নিশ্চয়ই বিড়ি খেয়ে ফিরে এসেছে। মণিকা উঠল না। চুপ করে বসে বসেই আরো ভালো করে নিজেকে দেখল। নিশ্বাসটা যেন একটু চঞ্চল, বুকের স্পন্দন যেন একটু বেশি জোরে শোনা যাচ্ছে।

আবার বেল বাজল। পর পর দুবার বাজল।

বেশ বিরক্ত হয়ে মণিকা উঠে গেল দরজা খুলতে।

ক্যাপ্টেন? ফিরে এসেছে? মণিকা থমকে দাঁড়ায়, চমকে ওঠে।

'তুমি?'

দরজার ওপাশে দাঁড়িয়েই ক্যাপ্টেন জবাব দেয়, 'সন্দেহ হচ্ছে নাকি?'

ক্যাপ্টেন ভেতরে পা দিয়ে ওর ঠিক সামনে দাঁড়াতেই মণিকা যেন মাতাল হয়ে ওঠে। দুটো হাত দিয়ে ক্যাপ্টেনের গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে, 'কি আশ্চর্য লোক বলতো তুমি।'

ক্যাপ্টেন অবাক না হয়ে পারে না। এই সেই মণিকা? যার গাম্ভীর্য, যার সংযম, যার সংযত আচরণ দেখে সে এক ধাপ এগোতে পারত না, এই সেই মণিকা? হঠাৎ এমন কালবৈশাখীর মাতলামির নেশা চাপল কেন ওর মাথায়?

'কেন বল তো?'

দরজার মুখেই বড় বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুজনে। তবু হুঁশ নেই।

ক্যাপ্টেন হুঁশ ফিরে পায়। 'কি ব্যাপার? বাড়িতে কেউ নেই নাকি?'

'না।'

'কেউ না?'

'না।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'চাকরটাও নেই?'

'না।'

এবার ক্যাপ্টেন নিজেই দরজাটা বন্ধ করে মণিকাকে একটু কাছে টেনে নেয়। হাত দিয়ে মুখটা একটু তুলে ধরে।

'কি হয়েছে?'

মণিকা জবাব দেয় না, দিতে পারে না। সে কি বলতে পারে যে নেকড়ে বাঘটা তাকে একবার আক্রমণ করে পরাজিত করেছিল, যে একবার তার রক্তের স্বাদ পেয়েছে, যৌবনের উপবন উপভোগ করেছে, সে আশেপাশেই রয়েছে? একথা কি বলা যায়?

ক্যাপ্টেন ডান হাত দিয়ে মণিকার চিকন কোমরটা জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে উপরে উঠে যায়।

দূরের আকাশে মিট মিট করে তারা জ্বলছে, আশেপাশের বাড়িগুলোতে আলো জ্বলে উঠছে। মণিকার অন্ধকার ঘরে এবার জ্বলে উঠল দুটি হৃদয় প্রদীপ।

মণিকা যেন আত্মসমর্পণের প্রস্তুতিতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। নদীর জলে যখন শূন্য কলসি ভরা হয়, তখন বগ্ বগ্ করে কত আওয়াজ, কত বুদ্ বুদ্। যখন ভরে যায়? সব কলরব—কোলাহল স্তব্ধ হয়।

মণিকাও পূর্ণ মন নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল ক্যাপ্টেনের পাশে।

আরও কয়েকটা অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনার মুহূর্ত কেটে গেল।

অফিসার্স মেসে, ক্লাবে-হোটেলে, পার্টিতে-ডিনারে বা কখনও কখনও মানুষের ভিড় থেকে দূরে, বহু দূরে ক্যাপ্টেন অনেক মেয়ের দেখা পেয়েছে। দেখা পেয়েছে রাজভবনে, দুর্গাপুর স্টিল টাউনের রানিকুঠিতে, জলপাইগুড়ির সার্কিট হাউসে। দেখা পেয়েছে নানা বেশে, নানা রং-এ নানা পরিবেশে! কিন্তু স্তব্ধ পরিবেশে এমন আত্মসমর্পণের নেশায় মশগুল আর কাউকে দেখেনি।

একি সেই মণিকা? নাকি অপারেশন থিয়েটারের পেসেন্ট? ক্লোরোফর্ম করা হয়ে গেছে! সার্জেন যা খুশি...

ক্যাপ্টেন ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নেয় মণিকাকে। একটু বেশি কাছে। এমন করে আর কোনোদিন কাছে টানেনি। অন্যদিন হলে মণিকা হয়তো লজ্জায় মুখে কিছু বলত না তবে হাতটা নিশ্চয়ই সরিয়ে দিত। সরিয়ে দেবে না কেন? এত অর্থপূর্ণ জড়িয়ে ধরাকে এখনই মেনে নেবে কেন? আজ কিচ্ছু বললে না।

'মণিকা?'

কথা বলে না।

'আজ তোমার কি হয়েছে বলতো?'

আরো কয়েকবার পীড়াপীড়ির পর ছোট্ট জবাব দেয় মণিকা, 'শরীরটা ভালো নেই।'

'শরীর না মন?'

জবাব আসে না এ প্রশ্নের।

'তোমার শরীর খারাপ লাগছে?'

'না।'

'দেখে মনে হচ্ছে তুমি বড় ক্লান্ত।'

মণিকা আবার চুপ করে যায়।

দুটো বালিশ টেনে ক্যাপ্টেন এবার মণিকাকে শুইয়ে দেয়। একটু হাত বুলিয়ে দেয় ওর মাথায়, মুখে।

মণিকা এবার ক্যাপ্টেনের হাতটা নেয় দুহাতের মধ্যে।

'ক-দিন ধরেই তোমার কথা ভাবছি।'

ক্যাপ্টেন খুশি হয়। 'কেন?'

সে কথার জবাব দেয় না মণিকা। শুধু বলে, 'তুমি আমাকে খুব ভালোবাস, তাই না?'

ক্যাপ্টেনের মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। 'তাই নাকি?'

সেই আবছা অন্ধকারেই জানালা দিয়ে ঠিকরে পড়া সামান্য আলোতেই দেখা গেল মণিকার মুখেও বেশ একটা চাপা তৃপ্তির হাসি।

'তুমি এত ভালো কেন বলতো?'

'তুমি খারাপ হতে দাও না বলে।'

'যদি কোনোদিন না দিই?'

'তোমারই লোকসান'

বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মণিকা বললে, 'ঘোড়ার ডিম!'

হঠাৎ খুব জোরে বেল বেজে উঠল। চমকে উঠল দুজনে।

মণিকা তাড়াতাড়ি উঠে বসে আলতো করে খোঁপাটা বাঁধতে বাঁধতে বললে, 'চাকরটা এসেছে নিশ্চয়ই।'

প্রায় সারা বাড়ি অন্ধকার। শুধু নিচের বারান্দায় একটা আলো। দুজনেই একটু লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলো।

ক্যাপ্টেন চলে গেল ডক্টর ব্যানার্জির স্টাডিতে। মণিকা টেবিল ল্যাম্পটার সুইচ টিপেই দরজা খুলতে চলে গেল।

দরজা খুলেই মণিকা চিৎকার করে বললে, 'এই তোর এক্ষুনি আসা হলো? তাড়াতাড়ি দুকাপ কফি কর।'

মণিকা স্টাডিতে আসতেই ক্যাপ্টেন বললে, 'তুমি তো দারুণ মেয়ে!'

একটু অবাক হয়ে মণিকা জানতে চাইল, 'কেন?'

ক্যাপ্টেন সে কথার জবাব না দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'তোমাকে দেখে যতটা সহজ-সরল মনে হয় তুমি তা না।'

মণিকার মনে খটকা লাগে। ওর অতীত জীবনের কোনো ইঙ্গিত পেল নাকি?

একটু চিন্তিত হয়ে ভ্রু কুঁচকে মণিকা জানতে চাইল, 'এতদিন পর হঠাৎ একথা বলছ?'

'নিজের অন্যায় ঢাকা দেবার জন্য চাকরটাকে বেশ সুন্দর ধমক দিলে তো!'

মণিকা আশ্বস্ত হয়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, 'অন্যায় আমার না তোমার?'

'আমি কি অন্যায় করলাম?'

'আমাকে একলা পেয়ে তোমার এমন সময় আসাটাই অন্যায় নয়?'

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন জবাব দিল, দরজা দিয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই তুমি গলা জড়িয়ে ধরবে বলেই তো এলাম।'

রবিশঙ্করের সেতারের সঙ্গে এ যেন আল্লারাখার তবলা! যেমন প্রশ্ন তেমন জবাব।

টেবিলের ওপাশ থেকে মণিকা এ-পাশে এসে দুহাত দিয়ে ক্যাপ্টেনের মুখটা চেপে ধরে বলে, 'বার বার বললে আর কোনোদিন অমন করে কাছে টেনে নেব না।'

মণিকার হাতটা সরিয়ে ক্যাপ্টেন একটু চাপা গলায় জানতে চাইল, 'বার-বার না বললে রোজ রোজ অমন করে আদর করবে তো?'

'জানি না।'

কফি এলো। ঘরের কোণায় বড় সোফাটার সামনের টেবিলে কফির কাপ দুটো নামিয়ে রেখে চাকরটা জিজ্ঞাসা করল, 'দিদিমণি কিছু খাবেন?'

'না।'

'সারাদিনই তো কিছু খেলেন না।'

'তুই যা। তোর আর মাতব্বরি করতে হবে না।'

চাকরটা চলে গেল।

'কি ব্যাপার খাওনি কেন?'

'তোমার জন্য।'

'আমার জন্য?'

'আবার কি? তুমি একলা একলা স্ফূর্তি করবে, ঘুরে বেড়াবে আর আমি এখানে একলা-একলা...'

মণিকা আর বলতে পারে না।

নিঃসঙ্গতার এত বেদনা? ক্যাপ্টেন জানত না, ভাবত না।

'মাসিমা-মেসোমশাই কোথায়?'

'নেমন্তন্নে গেছেন।'

'তুমি গেলে না?'

'না।'

'কি বললে?'

'বললাম শরীর খারাপ।'

ক্যাপ্টেন একটু ভাবল। কফির কাপে একবার চুমুক দিল।

'চল একটু ঘুরে আসবে।'

'এখন?'

'হ্যাঁ।'

'ফিরতে ফিরতে তো অনেক রাত হয়ে যাবে।'

'কখন ফিরতে চাও?'

'কিন্তু বাবা-মা'র সঙ্গে বেরুলাম না...'

শেষ পর্যন্ত সেদিন আর বেরুল না। ঠিক হলো পরের দিন বেরোবে। ক্যাপ্টেন হাতের প্যাকেটটা মণিকাকে দিয়ে বললে, 'এটা মাসিমাকে দিও।'

ক্যাপ্টেন ফিরে এল রাজভবনে। বড় কৌচটায় হেলান দিয়ে শুয়ে-শুয়ে পরপর দুটো

সিগারেট খেল।

চুপচাপ শুয়ে-শুয়ে কত কি ভাবছিল ক্যাপ্টেন। ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা নিজেও বুঝতে পারল না।

কিছুক্ষণ পর বিরাট ট্রে করে আমজাদ ডিনার নিয়ে এসে দেখল এ-ডি-সি সাহেব ঘুমোচ্ছেন। দু-একবার ডাকল। শেষ পর্যন্ত জবাব না পেয়ে আবার ওই ট্রে নিয়েই ফিরে গেল।

ক্যাপ্টেন ঘুমিয়ে পড়ে। হারিয়ে ফেলে সারাদিনের স্মৃতি। সুখ দুঃখ আনন্দ-বেদনা সোহাগ-ভালোবাসার স্মৃতি।

মণিকা?

দোতলার ওর ঘরে শুয়ে শুয়ে দূরের আকাশের অজস্র তারা দেখে আর হারিয়ে যায় নিজের স্মৃতির অরণ্যে। ঘুমোতে পারে না। কিছুতেই না। অনেক চেষ্টা করেও পারে না। ভাবে। কত কিছু, কত কিভাবে। আকাশ-পাতাল ভাবে।

ভাবে ক্যাপ্টেনকে। নিশ্চয় পায়জামা আর স্যান্ডো গেঞ্জিটা পরে উপুড় হয়ে দুটো বালিশ জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। নাকি ওই মোটা মোটা খাকির ইউনিফর্ম পরেই ঘুমোচ্ছে? কিচ্ছু বিচিত্র নয়। হয়তো ঘামে সমস্ত জামা-কাপড় ভিজে গেছে! হয়তো...

ভীষণ অস্বস্তিবোধ করে মণিকা। এপাশ-ওপাশ করল কয়েকবার। একবার উঠে বসে। বিছানা ছেড়ে একবার জানালার ধারে দাঁড়ায়!

দূর থেকে একটা তারা ছিটকে পড়ল? নাকি চোখের ভুল?

মনটা আরো বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকলেও মনটা ছটপট করে। ও কি খেয়েছে?

ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে নিজেই মাথা নেড়ে বলে না, না। এতদিনের ট্যুরের পর আজই ফিরেছে। ফিরেই তো চলে এসেছে আমার কাছে। রাজভবনের ফিরতে ফিরতেও বেশ রাত হয়ে গেছে। এত ক্লান্তির পর আর কি ইউনিফর্ম ছেড়ে স্নান করে খাওয়া-দাওয়া করতে পেরেছে?

নিশ্চয়ই অত ঝামেলার মধ্যে যায়নি। বড় কৌচটায় কাত হয়ে সিগারেট খেতে খেতে ঘুম এসে গেছে।

জ্বলন্ত সিগারেটটা হাতে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েনি তো?

কতদিন দুপুরে গিয়ে দেখেছে সিগারেট খেতে খেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। হাত থেকে সিগারেটটা পড়ে গেছে কার্পেটের ঠিক পাশেই। আচ্ছা যদি কার্পেটের উপর পড়ত? কার্পেটে আগুন লাগলে কি সর্বনাশ হতো বলো তো?

মণিকা ভীষণ রেগে যেত।

ক্যাপ্টেন হাসত। হাসতে হাসতেই ও মণিকার গাল দুটো চেপে ধরে বলত, 'জ্বলব না বলেই তো ভগবান তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।'

'বাজে বকো না।'

'বাজে না মণিকা। তা না হলে ঠিক এই সময়েই এখানে আসবে কেন?'

সেকথা ভেবে মণিকা আর শান্তি পায় না। দূরের আকাশের ওই তারাগুলো যেন হঠাৎ একটু বেশি দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলতে শুরু করেছে।

জানালার কাছে সরে আসে কিন্তু বিছানাতেও ফিরে যেতে পারে না। পায়চারি করে ঘরের মধ্যে।

কিন্তু এখন এই রাত্রিতে কে ওর ঘরে গিয়ে দেখবে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে কিনা? বেয়ারা-চাপরাশীরাও তো আর এখন ওর ঘরে যাবে না।

হা ভগবান। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মণিকা। কি বিশ্রী অশান্তি!

বিছানার উপর বসে বসে এবার ভাবে। হঠাৎ নিজের উপরই রাগ হয়। নিজেকেই অপরাধী মনে হয়। এতদিন পর কত ক্লান্ত হয়ে এলো। তবুও তো আমি ওকে কিছু খেতে দিলাম না। নিশ্চয়ই ভীষণ খিদে পেয়েছিল। শুধু এক কাপ কফি খাইয়েই...

আচ্ছা ও কি ভেবেছিল এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবে? এমন সময় এলে তো মা কোনোদিন না খাইয়ে ছাড়েন না! তাছাড়া ও তো জানত না মা নেমন্তন্নে গেছেন। আমজাদ-রমজনেকেও হয়তো বলে এসেছিল ডিনার খাবে না।

দুটো হাঁটুর ওপর মুখ রেখে চুপচাপ বসে থাকে মণিকা। চুপচাপ বসে থাকলেও মনের মধ্যে সমুদ্রের গর্জন চলে অবিশ্রান্ত ধারায়।

কি বিশ্রী অশান্তি! ষোল আনা দুশ্চিন্তা আছে, সে দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্ত হবার ক্ষমতাও আছে কিন্তু নেই সে সুযোগ। এক বিচিত্র অনুভূতি। সব কিছু থেকেও কিচ্ছু করার নেই।

আচ্ছা একবার টেলিফোন করলে হয় না? নিজে যখন যেতে পারছি না তখন অন্তত টেলিফোনেও বলতে পারি, ইউনিফর্ম পরেই ঘুমোচ্ছ নাকি? পায়ের জুতো-মোজাও নিশ্চয়ই...

শেষে বলতে পারত, আর কত কাল আমাকে এমন দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হবে বলতে পার?...

কিন্তু টেলিফোন তো নীচে। পাশের ঘরেই বাবা-মা ঘুমোচ্ছেন। বারান্দার কোণায় তো আবার চাকরটা শুয়ে থাকে। অন্ধকারে পা টিপে টিপে না হয় নীচে গেলাম। তবুও টেলিফোন করতে হলে তো আলো জ্বালাতেই হবে। তাছাড়া ও ঘরের সব দরজা-জানালা বন্ধ। বাইরের একটু আবছা আলো আসারও পথ নেই।

আলো জ্বাললেই তো জানাজানি হয়ে যাবে। চাকরটা উঠে পড়বে, বাবা-মা টের পেতে পারেন। কি কৈফিয়ত দেব ওদের?

অন্ধকারে টেলিফোন করতে পারব না? কোনো কিছুতে ধাক্কাটাক্কা খেয়ে পড়ব না তো?

তাহলে তো আরো কেলেঙ্কারি! বাড়িতে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

আর যেন ভাবতে পারে না। মণিকা ছটপট করে। বিছানা ছেড়ে আবার জানালার ধারে দাঁড়ায়। চারধারে তাকিয়ে দেখে। নিস্তব্ধ পৃথিবী। দিনের অশান্তি, দাপাদাপি নেই। বাতাসে আগুনের হলকা নেই। দিনের বেলায় অজস্র লালসার মোহে পাগলের মতো যারা ছুটে বেড়ায়, তারাও ঘুমোচ্ছে। দীন-দরিদ্রের দল সারাদিন ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করেছে, দিনের শেষে কোনোমতে একমুষ্টি অন্ন পড়েছে ওদের পেটে কিন্তু এই গভীর রাত্রিতে তারাও ঘুমোচ্ছে। কেউ প্রাসাদে, কেউ ফুটপাথে। তা হোক না। চিন্তা-ভাবনা-দুশ্চিন্তা থেকে এখন সবার ছুটি। ঠগ-জোচ্চোর লম্পট-বদমাইশরাও আর জেগে নেই।

দরজা খুলে ছাদে বেরিয়ে আসে মণিকা। একবার বৈকুণ্ঠবাবুর বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে। না, ওদের ঘরেও আলো জ্বলছে না। বৌদি তাহলে রোগের জ্বালা থেকেও একটু ছুটি পেয়েছেন,

একটু ঘুমিয়েছেন।

অন্যদিন যখনই ঘুম ভেঙেছে, তখনই দেখেছে ওদের ঘরে আলো জ্বলছে। একেবারে শেষ রাত্তিরের দিকেই তো উনি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। তবে কি রাত অনেক হলো?

ছাদের এদিক-ওদিক ঘুরে মণিকা আবার ফিরে আসে ঘরে। ওই জানালার ধারে। একটু দাঁড়ায়, একটু পায়চারি করে, আবার একটু বসে।

তবে কি একবার আলো না জ্বালিয়েই পা টিপে টিপে নেমে যাব? খুব আস্তে আস্তে ফিসফিস করে কথা বললে কি কেউ শুনতে পাবে?

শেষ পর্যন্ত অন্ধকারেই পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। শেষ ধাপ পর্যন্ত নেমে গেল কিন্তু বারান্দায় কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। চাকরটা কোথায় শুয়ে আছে? এই এত রাত্রে এত অন্ধকারে যদি চাকরটার উপর গিয়ে পড়ে? তাহলে ও কি ভাববে?

তাছাড়া...

তাছাড়া আবার কি? ও যদি বলাইদার মতো মুহূর্তের জন্য পাগল হয়ে ওঠে? কিচ্ছু বলা যায় না। হাজার হোক পুরুষ! ঠিক জোয়ান না হলেও প্রৌঢ় নয়। বড় সর্বনাশা বয়স। এই রাত্রের অন্ধকারে ও নিজেকে বাঁচাবে কেমন করে? লজ্জায় চিৎকার পর্যন্ত করতে পারবে না।

ফিরে যাব? নীচে এসেও ফিরে যাব?

আবার আস্তে আস্তে উপরে উঠে যায় মণিকা। পিঠে দুটো বালিশ দিয়ে একটু কাত হয়ে বসে বিছানায়। ঠিক করল ভোর হতে না হতেই টেলিফোন করবে ক্যাপ্টেনকে। তারপর দেখা হলে বলবে, যাকে ভালোবাস তাকে কাছে টেনে নেবার পৌরুষটুকুও তোমার নেই?

মনে মনে রিহার্সাল দেয় মণিকা।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। চাকরটার ডাকাডাকিতে।

চোখ মেলেই চাকরটাকে দেখে চমকে উঠে মণিকা! মুহূর্তের জন্য রাত্রের বিভীষিকার কথা মনে আসে।

পাশ ফিরতেই এক টুকরো রোদ্দুর চোখে এসে পড়ায় হুঁশ ফিরে আসে।

'চা এনেছিস?'

'হ্যাঁ এইতো।'

'রেখে যা।'

পাশ ফিরে শুয়ে চায়ের কাপে এক চুমুক দিতে না দিতেই মা এসে বললেন, 'হ্যাঁরে তোর টেলিফোন।'

'আমার টেলিফোন?'

মা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, তোর টেলিফোন। তাড়াতাড়ি আয়।'

পুরো চা না খেয়েই নেমে গেল মণিকা।

'হ্যালো...'

'কিরে তোর যে কোনো পাত্তাই নেই?'

ক্যাপ্টেন নয়?

'কে বলছিস?'

'আজকাল কথা শুনেও বুঝতে পারিস না?'

সত্যি বুঝতে পারেনি মণিকা। একে ঘুম থেকে উঠেছে, তারপর ভেবেছিল গভর্নমেন্ট হাউস থেকে ফোন এসেছে। তাছাড়া ভিক্টোরিয়ার পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে প্রায় যোগাযোগ নেই বললেই

চলে। কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, তার ঠিকঠিকানাই নেই। দুচারজন ছাড়া আর কেউ কলকাতা নেই। আরতির সঙ্গে কদিন আগেই হঠাৎ দেখা হয়েছিল। তারপর ও কয়েকদিনের জন্য আবার দার্জিলিং চলে গিয়েছিল।

'ঘুম থেকে উঠেই তোর টেলিফোন ধরতে এলাম আর তুই বকতে শুরু করেছিস?'

'এখন ঘুম থেকে উঠলি?'

'তবে কি? আমি কে তোদের মতো প্রিজনার হয়ে গেছি?'

'ওসব বীরত্ব অন্যকে দেখাস। বল, কখন আসছিস?'

'তুই আয় না।'

'না, না তুই আয়। অনেক কথা আছে।'

মণিকা উত্তর দেবার আগেই আরতি আবার বলে, 'দেরি করবি না কিন্তু? আর মাসিমাকে বলে আসিস কখন ফিরবি ঠিক নেই।'

'তার মানে?'

'আয় না! দুজনে বেরিয়ে পড়ব।'

'নট এ ব্যাড আইডিয়া বাট...'

আরতি আর কথা বাড়ায় না। 'আর বকতে পারছি না, তাড়াতাড়ি চলে আয়।'

টেলিফোন রিসিভার নামিয়ে রাখার পর মণিকা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। কাল রাত্তিরের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল উৎকণ্ঠা ভরা প্রতিটি প্রহরের কথা, প্রতিটি মুহূর্তের বেদনা, জ্বালা।

ভেবেছিল ভোরবেলায় উঠেই ফোন করবে, দরকার হলে একবার ছুটে গিয়ে দেখে আসবে।

ভোরবেলায় সম্ভব না হলেও একটু বেলা হলে নিশ্চয়ই যেত কিন্তু...

আরতির টেলিফোন এসেই সব গোলমাল হয়ে গেল। তবে...

হয়তো মনটা একটু হালকা হবে। একটু হাসি ঠাট্টা করে কিছু সময় কাটবে। নিজের কাছ থেকে নিজেকে আর এমন করে লুকিয়ে রাখতে হবে না। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য।

তাছাড়া আরতি ওর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ভিক্টোরিয়ায় পড়ার সময় ওরা পাশাপাশি ঘরে থাকত। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া হলেই মাঝে মাঝে চলে যেত ওই লনের কোণায়। কত কথা, কত গল্প, গান হতো দুজনের।

বাংলার লেকচারার প্রফেসর রায়চৌধুরি আরতিকে একটু বেশি খাতির করতেন বলে অনেকেই সন্দেহ করত। ঠাট্টা তামাসাও করত। আরতি সবার কাছে স্বীকার করতে চাইত না কিন্তু রাত্রিবেলায় লনের ওই কোণায় বসে মণিকার সঙ্গে গল্প করতে করতে জানতে চাইত, 'আচ্ছা মণিকা তোর কি মনে হয় রে?'

'আগে বল তোর কি মনে হয়?'

হঠাৎ আরতি চঞ্চল হয়ে উঠত, 'জানিস আজকে কি হয়েছে?'

'কি?'

'আমি লাইব্রেরির ওই ভেতরের ঘরটায় একটা রেফারেন্স বই দেখতে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা...'

'ওখানে আর কেউ ছিল?'

'না!'

'তোকে কিছু বললেন নিশ্চয়ই।'

'হঠাৎ আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'চেহারাটা প্রতিদিনই আরো বেশি সুন্দর হচ্ছে,

এবার পড়াশুনাটাও একটু...'

মণিকা উত্তেজনায় আরতির হাতটা চেপে ধরে বলল,

'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।'

সে সব দিনের কথা মনে হতেই মণিকা আপন মনে হাসতে হাসতে বার্মিজ ছাতাটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

হাসিমুখেই আরতি অভ্যর্থনা করল। ওটাই ওর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে আরতির। একে সুন্দরী তারপর হাসি-খুশি। চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত! হয়তো প্রফেসর রায়চৌধুরিকেও। হয়তো আরো কাউকে। বা অনেককেই। পিছলে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়েছে। সব সময়ই?

প্রাণ খুলে হাসতে হাসতেই সব কথা বলত মণিকাকে। আরতির সব কিছু মেনে নিতে পারত না। তবুও ভালো লাগত, ভালোবাসত।

'এখনও কি সবার কাছেই এমন হি-হি করে হাসিস্?'

'হাসব না কেন?'

'এত রূপ আর এত হাসি, ভালো না! কোনোদিন যে বিপদে পড়বি!'

দরজা দিয়ে বারান্দায় পা দিয়েই মণিকা বলল।

আরতি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'বিপদে যে পড়িনি সেকথা তোকে কে বলল?'

'পড়েছিস?'

'পড়ব না?'

'কার কাছে রে?'

আরতি এবার মোড় ঘুরতে চায়, চল চল, উপরে চল।

'আগে বল কার কাছে বিপদে পড়েছিস।'

'আঃ তুই উপরে চল না!'

'আই উইল নট মুভ অ্যান ইঞ্চ আনলেস...'

আরতি হাসতে হাসতে, মণিকার কানে ফিসফিস করে বলল, 'যদি বলি তোর বলাইদা!'

'বলাইদা।' প্রায় আঁতকে ওঠে মণিকা।

'কেন বলাইদা কি ভগবান?'

কোন জবাব দেয় না মণিকা। মুহূর্তের জন্য যেন পাথর হয়ে গেছে। মাথাটা যেন ঘুরে উঠল।

আরতি একটু পরে আবার বলল, 'তোর তো ধারণা বলাইদা একটা ডেমি-গড। বাট আই সে হি ইজ জাস্ট এ ম্যান।'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কোনো কথা হলো না। সিঁড়ি দিয়ে আরতির বড়দা নেমে এলেন, 'কেমন আছ মণিকা?'

অনেকদিন পর বড়দাকে দেখে ভালো লাগল। সব চাইতে ছোট বোনের বন্ধু বলে স্নেহ করতেন ওকে।

মণিকা তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম করল। 'ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন।'

'ভালোই আছি, তবে বয়স হয়েছে তো!'

বড়দা শেষে বললেন, 'এখন অফিস যাবার সময়। কথাবার্তা বলতে পারলাম না। আর একদিন

এসো।'

'আসব।'

বড়দা গাড়িতে উঠে চলে গেলেও মণিকা ওই দিকেই চেয়ে রইল।

'কি রে কি দেখছিস?'

ঘাড় নাড়তে নাড়তে মণিকা উত্তর দেয়, 'কিচ্ছু না।'

'তবে ওদিকে চেয়ে আছিস যে?'

'ভাবছি...'

'কি ভাবছিস?'

'বড়দার কথা।'

আরতি কিছু বলল না। বড়দাকে ওরা সবাই ভীষণ ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে।

উপরে থেকে আরতির মা ডাক দিলেন, 'কি রে তোরা ওপরে আসবি না?'

আর দেরি করে না। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল দুজনেই।

আরতির মাকে প্রণাম করে মণিকা চলে গেল ওই বহুদিনের পরিচিত কোণার ঘরে। আরতির ঘরে। কতদিন কাটিয়েছে এই ঘরে। কত স্মৃতি জমে আছে এই ঘরে!

ঘরে ঢুকেই মণিকা দরজা বন্ধ করল।

'দরজা বন্ধ করছিস কেন?'

মণিকা সে কথার জবাব না দিয়ে আরতিকে টেনে এনে পাশে বসাল!

'বলাইদার কথা তো আগে বলিসনি?'

'তুই কি জানতে চেয়েছিস?'

লুকিয়ে চুরিয়ে কথা বলার বালাই নেই আরতির। 'তাছাড়া ভিক্টোরিয়া ছাড়ার পরই তো রেঙ্গুনে চলে গেলি...'

সব কথা খুলে বলেছিল আরতি। সেফ ডিপোজিট ভল্ট বা ফিক্সড ডিপোজিটে ওর বিশ্বাস নেই। ইন্টারেস্ট নেই। আরতি যেন জীবন্ত কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। জীবনের সম্পদ গচ্ছিত রাখে না, সঙ্গে সঙ্গে চেক কেটে উইথড্র করে বলে দেয় বন্ধুদের। মণিকাকে।

'বি-এ পাশ করার পরই বড়দা কলকাতা এসে গেলেন। আমি এখান থেকেই ইউনিভার্সিটি যাতায়াত করতাম। একদিন...'

কী ভীষণ বৃষ্টি হলো! ট্রাম-বাস তো দূরের কথা মানুষের হাঁটা চলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। ওই টিপ-টিপ বৃষ্টির মধ্যেই ভিজতে ভিজতে একদল চলে গেল ওয়াই-এম-সি-এ রেস্টুরেন্টে। আরতি, শুভ্রা, জয়া আর সঙ্ঘমিত্রা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল মেট্রো। মার্লিন ব্র্যান্ডোর 'টি হাউস অফ দি আগস্ট মুন' দেখতে।

ইন্টারভ্যালের সময় ইনার-লবিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পপকর্ন খাবার সময় হঠাৎ বলাইদার সঙ্গে দেখা।

'আরে বলাইদা যে।'

বলাইদা খুশি হলেন আরতিকে দেখে। 'ভুলে যাওনি দেখছি!'

'ভিক্টোরিয়ায় পড়বার সময় আপনার এত চকলেট-কেক-পেস্ট্রি খাবার পরও ভুলে যাব?'

আরতি আলাপ করিয়ে দিল, এরা আমার বন্ধু। শুভ্রা, জয়া, সঙ্ঘমিত্রা। সবাই একসঙ্গেই ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি।

এবার বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, 'আওয়ার ইউনিভার্সাল বলাইদা! আসলে মণিকার বলাইদা

হলেও উই হ্যাভ এনজয়েড হিজ জেনরসিটি টু অফন্।'

'ডোন্ট সে অল দিস্।'

সিনেমা শেষ হবার পর বলাইদা ওদের চারজনকে নিয়েই গ্রান্ডে গেলেন। ওর ঘরে। চ-কফি-স্ন্যাকস-এ সেন্টার টেবিল ভরে গেল।

জয়া বলল, 'এই এত?'

আরতি সাবধান করে দেয়, 'ডোন্ট আর্গু! বলাইদা গত জন্মে আমাদের ঠাকুমা ছিলেন। তাই একটু ভালো করে না খাইয়ে শান্তি পান না।'

আরতি হাসে। বলাইদা ওর মাথাটা ধরে একটা ঝুঁকুনি দিয়ে বললেন, 'হাসতে শুরু করলে তো!'

আবার হাসতে হাসতে আরতি বলে, 'দিন, দিন একটু ভালো করে মাথাটা ধরে ঝাঁকুনি দিন তো! আপনার মতো ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট-এর হাতে ঝাঁকুনি খেয়ে যদি ব্রেনটা একটু সতেজ হয়।'

কয়েকদিনের জন্য কলকাতা এসেছিলেন বলাইদা। চা-কফি খাইয়ে বিদায় দেবার সময় বললেন, 'কালকে একবার টেলিফোন করবে তো?'

'কখন?'

'এনি টাইম ইউ লাইক।'

পরের দিন দুপুরের দিকে একটা ক্লাশ করেই আরতি ইউনিভার্সিটি থেকে চলে গিয়েছিল বলাইদার হোটেলে। বেশ লাগল। এত বড় হোটেলে আসার একটা রোমাঞ্চ আছে বৈকি! ছাত্রজীবনে যে আনন্দ, যে সম্মান পাবার নয়, আরতি তাই পেয়েছে। খুব খুশি।

সেই চির-পরিচিত হাসিটি সারা মুখে ছড়িয়ে বলাইদাকে বললে, 'এসে গেছি তো?'

একটু আদর করে বলাইদা বললেন, 'এই হাসিটুকু এনজয় করার জন্যই তো আসতে বলেছি।'

আরতি আরো খুশি হয়।

তারপর লাঞ্চ। ওই ঘরে বসেই। ঠিক খিদে না থাকলেও আরতি বিশেষ আপত্তি করল না। খেতে খেতে হাসি-ঠাট্টা।

'তোমার হাসি আমি মুভিতে তুলে রাখব।'

'মুভিতে?'

মুভিতে আরতিকে ধরা হলো। তার হাঁটা-চলা ওঠা বসা! সব কিছু।

'একেবারে ওই কোণা থেকে একবার জোরে জোরে এদিকে এসো তো।'

'এবার টায়ার্ড হয়ে গেছি। আর পারছি না।'

'এখনই টায়ার্ড?'

'কাল বৃষ্টিতে ভিজে সারা শরীরটা বেশ ব্যথা হয়েছে।'

'ব্যথা?' বলাইদা মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবলেন। 'সেকথা আগে বলোনি কেন?'

'...জানিস মণিকা, এক গেলাস গরমজলে কি একটা ওষুধ মিশিয়ে বলাইদা আমাকে খেতে দিলেন। বললেন পনের-বিশ মিনিট রেস্ট নাও। সব সেরে যাবে।'

'তারপর?' মণিকা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকতে থাকতে জানতে চায়।

'আস্তে আস্তে ঔষুধটা খেলাম। সারা শরীরটা বেশ গরম হয়ে উঠল। আর শুরু হলো আমার হাসি। কথায় কথায় হাসি। আমি বেশ বুঝতে পারলাম বলাইদা আমার কাছে এসেছেন, কথায় কথায় আমার গায়ে হাত দিচ্ছেন, আদর করছেন...'

'তুই কিছু বলছিলি না?'

'না। কেমন যেন একটা নেশার ঘোরে মজা লাগছিল। তাছাড়া কথায় কথায় এত হাসি পাচ্ছিল যে কি বলব?...

'তোকে কি হুইস্কি-টুইস্কি খাইয়েছিলেন?'

'তা জানি না রে। বোধহয় ব্র্যান্ডি! নিশ্চয়ই ডোজটা বেশ বেশি ছিল আর তাই আমার নেশা হয়েছিল।'

আরতি একটু থামে। একবার ভালো করে মণিকাকে দেখে নেয়।

'আমার' পর খুব ঘেন্না হচ্ছে, তাই না?'

মণিকা একটু হাসে। বোধহয় একটু কষ্ট করেই হাসে। 'ঘেন্না হবে কেন?' যে বন্ধু এমন গোপন কথা খুলে বলতে পারে, তার' পর রাগ হয়?'

আরতি আবার শুরু কর।

'কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সারা শরীর দিয়ে আগুন বেরোতে শুরু করল। নিজেই বোধহয় কিছু কাপড়-চোপড় সরিয়ে বড় কৌচটায় শুয়ে পড়লাম। মনে আছে বলাইদা আমাকে কোলে করে বিছানায় শুইয়ে দিলেন...'

'হতচ্ছাড়ি মেয়ে কোথাকার!' মণিকা যেন স্বগতোক্তি করে।

আরতি খিল খিল করে হাসে। 'কি করব বল? আই ওয়াজ হেলপ্লেস।'

'থাক থাক! আর শুনতে চাই না তোর কীর্তি।'

'খুব রেগে গেছিস তো?'

'রাগব কেন?'

'আমার কীর্তি-কাহিনি শুনে রাগ হয়নি?'

'না।'

'তবে অমন করে কথা বলছিস কেন?'

তাইতো? মণিকা নিজেই যেন একটু অবাক হয়। হাত দিয়ে জানালার পর্দাটা সরিয়ে বাইরের শূন্য আকাশ দেখতে দেখতে উত্তর দিল, 'হয়তো দুঃখে।'

'কিসের দুঃখ কার জন্য দুঃখ?'

'তোর জন্য। হয়তো বলাইদার জন্যও।'

আরতি এবার একটু সিরিয়াস হয়।

'দ্যাখ মণিকা, একটা কথা বলি। এমনি টুক-টাক অ্যাকসিডেন্ট বহু মেয়ের জীবনেই ঘটে কিন্তু আমরা স্বীকার করতে পারি না। স্বীকার করতে চাই না...'

মণিকা প্রতিবাদ করে। কিন্তু ঠিক আগের মতো জোর করে নয়। 'তুই যেন সব মেয়ের কথা জানিস!'

'সবার কথা না জানলেও ভিক্টোরিয়া আর ইউনিভারসিটির কিছু মেয়ের কথা জানি...'

মণিকার মনে দ্বিধা আসে। আর এসব আলোচনা করতে চায় না। 'এই সবই আলোচনা করবি নাকি বেরুবি।'

আরতি উঠে দাঁড়ায় 'দাঁড়া। কিছু খাওয়া-দাওয়া করি। তারপর তোর কথা শুনি!'

'আমার আর কি কথা শুনবি?'

'গতবার তো শুধু ফটোটা দেখিয়েই পালিয়ে গেলি। কিছুই তো শোনা হলো না।'

'শোনাবার মতো এখনও কিছু হয়নি!'

'লুকোবার মতো কিছু না হলেও শোনাবার মতো নিশ্চয়ই অনেক কিছু হয়েছে।'

একটু লজ্জা, একটু দ্বিধা এলেও আরতির মতো বন্ধুকে কিছু না বলে শান্তি পাচ্ছিল না মণিকা।

'জানিস আরতি আমি যেন মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি। ঠিক ভালো লাগছে না। তাছাড়া...'

'তাছাড়া কি?'

'ও এমন একলা একলা থাকে যে বড় দুশ্চিন্তা হয়। কাল সারারাত তো ঘুমোতেই পারিনি।'

'কেন?'

'নানা কারণে।'

আরতি হাসে। বলে, 'যাই বলিস খুব ইন্টারেস্টিং হাজব্যান্ড হবে তোর। একবার আলাপ করিয়ে দিবি না?'

ঠিক লাঞ্চ টাইমে মণিকা রাজভবনে টেলিফোন করল।

'কি, খেতে বসেছ?'

'না। একটু দেরি আছে।'

'আমি আসব?'

'বারণ করেছি কোনোদিন?'

'লাঞ্চ খেয়েই তো আবার গভর্নরের কাছে দৌড়বে?'

'ইউ আর মোর ইম্পার্ট্যান্ট দ্যান গভর্নর টু মি।'

'তাইতো কেবল ট্যুর করে করে ঘুরে বেড়াও।'

আরতি হঠাৎ টেলিফোনটা কেড়ে নেয় মণিকার হাত থেকে।

'গুড আফটারনুন। আমি আরতি। মণিকার সঙ্গে আমিও থাকতে পারি তো?'

'উইথ প্লেজার।'

নর্থ গেট পুলিশ অফিসের সামনে ট্যাক্সি দাঁড়াল! মণিকা একবার বাইরের দিকে মুখ বাড়াতেই সার্জেন্ট হাত নেড়ে ট্যাক্সিকে ভিতরে যেতে বলল। মার্বেল হলের সামনে পোর্টিকোতে ট্যাক্সি থামতেই একজন বেয়ারা এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল, মণিকা ব্যাগ থেকে টাকা বার করে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ভিতরের দিকে ফিরতেই দু'জন বেয়ারা সেলাম দিল। লিফট-এর সামনে আসতেই লিফট্-ম্যানও সেলাম দিল।

মণিকাকে নিয়ে ফিস ফিস আলোচনার দিন শেষ হয়েছে রাজভবনে। নর্থ গেট পুলিশ অফিস থেকে শুরু করে সমস্ত বেয়ারা চাপরাশী-লিফট্ম্যানরাই চিনে গেছে মণিকাকে। আমজাদ, রমজান থেকে নটবর সবার সঙ্গেই ওর বেশ ভাব। ক্যাপ্টেন হঠাৎ কাজে বেরিয়ে গেলে মণিকা তো ওদের সঙ্গেই গল্প করে।

লিফট্-এ উঠতেই মণিকা বলল, 'কি নটবর, তোমার ছেলের মুখে ভাত দেবে কবে?'

নটবর কৃতজ্ঞতায় প্রায় গলে যায়। 'আর আমাদের ছেলের আবার মুখে ভাত!'

'আঃ। ওসব কথা বলে না। দিন ঠিক করে আমাকে খবর দিও।'

নটবর আর উত্তর দিতে পারে না। লিফ্ট-এর দরজা খুলে দিয়ে মুখ নীচু করে শুধু মাথাটা কাত করে।

করিডোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে আরতি বললে, 'তুই তো বেশ জমিয়েছিস!'

দরজা নক্ করে ভিতরে ঢুকতেই ক্যাপ্টেন অভ্যর্থনা করল, 'আসুন, আসুন।'

মণিকা আলাপ করিয়ে দিল, 'আমার বন্ধু আরতি। ভিক্টোরিয়ায় একসঙ্গে পড়তাম। তারপর এম-এ পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়ে গেল।'

ক্যাপ্টেন মণিকাকে একটু শাসন করল, 'পুরো নামটা না বললে কি আলাপ করানো হয়?'

মণিকা উত্তর দেবার আগেই আরতি বললো, 'আমি মিসেস আরতি সরকার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

বড় কৌচটায় ওরা দু'জনে আর ছোট কৌচে ক্যাপ্টেন বসল।

'মিঃ সরকার কি কলকাতাতেই থাকেন?'

মণিকা বললে, 'না উনি কার্শিয়াং-এর ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার।'

'হোয়াট এ লাকি গার্ল? ইন্ডিয়াতে থেকেও সারা বছর কন্টিনেন্টাল ক্লাইমেট এনজয় করেন?'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আরতি জবাব দেয়, 'হ্যাঁ! তা বটে! দ্বারভাঙা বিল্ডিং ছেড়ে ডি-এফ-ও'র বাংলো! তাছাড়া সকাল-সন্ধ্যায় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কফিহাউস বা বেকার ল্যাবরেটরির মাঠে আড্ডা না দিয়ে কিছু চোর-জোচ্চোর কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে নিত্য সন্ধ্যা কাটান নট এ ব্যাড থিং।'

একটু থেমে আরতি হাসতে হাসতে বলে, 'তাই না?'

মণিকা একটু শাসন না করে পারে না। 'আলতু-ফালতু বকবি না তো আরতি। তোর মতো সুখে কটা মেয়ে থাকে বল তো?'

'সুখ?' আরতি মুহূর্তের জন্য সিরিয়াস হয়। পরমুহূর্তে রং বদলায়। হাসতে শুরু করে। 'এক্সকিউজ মি ক্যাপ্টেন রয়, আপনি কি আমাদের লাঞ্চ খাওয়াবেন?'

'একশো' বার। উইথ প্লেজার, বাট...'

মণিকা জিজ্ঞাসা করল, 'আমজাদ কোথায়?'

'একটু বাইরে পাঠিয়েছি। এক্ষুনি আসবে।'

'কিছু আনতে পাঠিয়েছ।'

'হ্যাঁ।'

'কি?'

ক্যাপ্টেন উঠে গিয়ে একটা টেলিগ্রাম এনে মণিকার হাতে দিল। 'আজ সকালেই মা-র কাছ থেকে পেলাম...'

'তোমার আজ জন্মদিন?'

'হ্যাঁ।'

আরতি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা এগিয়ে দিল, 'উইস ইউ বেস্ট অফ লাক ক্যাপ্টেন।'

হাসি মুখে হ্যান্ডসেক করে ক্যাপ্টেন বলল, 'মেনি মেনি থ্যাঙ্কস।'

মণিকা আবার প্রশ্ন করে, 'কই আমাকে তো কিচ্ছু বলোনি?'

'মা-র টেলিগ্রামটা পাবার পরই তোমাকে টেলিফোন করেছিলাম। শুনলাম বেরিয়ে গেছ।'

'তুমি টেলিফোন করেছিলে?'

'একবার না, কয়েকবার।'

এর মধ্যে দরজা নক্ করেই আমজাদ একটা বড় প্যাকেট হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। 'লিজিয়ে সাব।'

'প্যাকেটটা খুলে আন।'

মণিকা জানতে চাইল, 'কিসের প্যাকেট?'

'মা কিছু মিষ্টি-টিষ্টি পাঠিয়েছেন আর কি! একটু আগেই আই-এ-সি থেকে জানাল,

এলাহাবাদ থেকে একটা প্যাকেট এসেছে। তাই ভাবলাম মা-র দেওয়া মিষ্টিটা খেয়েই লাঞ্চ খাব।'

আরতি বলল, 'চলুন লাঞ্চ খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। উই উইল সেলিব্রেট ইওর বার্থডে।'

আমজাদ প্যাকেটটাকে খুলে ঘরে ঢুকতেই মণিকা এগিয়ে গেল, 'দাও।'

আমজাদ ফিরে যাচ্ছিল। মণিকা বলল, 'দাঁড়াও আমজাদ, চলে যেও না।'

প্যাকেট থেকে একটা মিষ্টি বের করে আমজাদকে দিয়ে বলল, 'আজ তোমাদের সাহেবের জন্মদিন। তাইতো এই মিষ্টি এলাহাবাদ থেকে মা পাঠিয়েছেন।'

আমজাদ হাত তুলে কপালে ঠেকাল, 'আল্লা সাহেবের ভালো করুন।'

'যাও এবার তুমি লাঞ্চ দেবার ব্যবস্থা কর।'

আমজাদ চলে গেল। মণিকা দুটো মিষ্টি বের করে ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিল, নিজেরাও দু'জনে নিল।

হঠাৎ আমজাদ ফিরে এলো। 'সাব, দশ মিনিট টাইম নিচ্ছি।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

দশ মিনিট নয়, পনের-কুড়ি মিনিট পরে বুড়ো রমজানই প্রথম ঘরে ঢুকল। হাতে একটা বিরাট ফুলের তোড়া। পিছনে আমজাদ, গঙ্গা, নটবর ও তিন চারজন।

ফুলের তোড়াটা ক্যাপ্টেনকে এগিয়ে দিয়ে রমজান বলল, 'বহুত বহুত মুবারক হো সাব।'

গঙ্গার হাতে বিরাট একটা কেক। আমজাদ আর ওরা ডাইনিং টেবিলে লাঞ্চ রাখল।

মণিকা খুব খুশি। আরতিও। ক্যাপ্টেন একটু বিস্মিত। মুগ্ধ।

বড় আনন্দে কাটল সারাদিন। সারা সন্ধ্যা। খাওয়া-দাওয়া হাসি-ঠাট্টা-গান।

শেষে আরতিকে নামিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন মণিকাকে পৌঁছতে গেল। গাড়ি থেকে নামবার আগে মণিকা একটু নীচু হয়ে ক্যাপ্টেনকে প্রণাম করল।

ক্যাপ্টেন মণিকার হাত দুটো চেপে ধরে বলল, 'একি করছ?'

'আমজাদ-রমজান কত কি তোমাকে দিল। আমি না হয় শুধু একটা প্রণাম করেই শ্রদ্ধা জানালাম।'

কদিন পরেই গভর্নর দার্জিলিং যাবেন। গ্রীষ্মাবকাশে। ডারবি-সায়ারের কেডলস্টন হলের অনুকরণে ক্যাপ্টেন ওয়েট যখন কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউসের পরিকল্পনা করেছিলেন, তখন গরমের দিনে এর বাসিন্দাকে পালিয়ে যেতে হবে ভাবেননি। যার জন্য এই প্রাসাদের জন্ম, সেই লর্ড ওয়েলেসলীও কল্পনা করেননি। বিয়াল্লিশ বছরের উন্মত্ত ওয়েলেসলী সব ঋতুতেই সমানভাবে খুশিতে থেকেছেন এই গভর্নমেন্ট হাউসে।

তারপর যুগ পাল্টে গেল। ক্লাইভ স্ট্রিটের সাহেব-সুবাদের সঙ্গ দেবার জন্য ওয়েলেসলির উত্তর সাধকরা দার্জিলিং যাতায়াত শুরু করলেন।

ওয়েলেসলি-কার্জন-বেন্টিকের চৌদ্দ পুরুষকে গালাগালি দিয়ে যারা এই গভর্নমেন্ট হাউস দখল করল, তারাও হয়তো এই ক্লাইভ স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট, চৌরঙ্গীর সাহেব-সুবাদের মুখ চেয়েই

দার্জিলিং শৈল শিখরে বসে বসে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে ঠাট্টা করার লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না।

তাই তো লাটসাহেবকে আজও গরমের দিনে পালাতে হয় লর্ড ওয়েলেসলির স্বপ্নের প্রাসাদ ছেড়ে।

কলকাতায় তবু ভিজিটার্স আসে, মিটিং-কনফারেন্স-সেমিনার আছে। ভাগ্য ভালো হলে ঘুষখোর সরকারি ইঞ্জিনিয়ারদের তদারকিতে তৈরি নতুন সরকারি অপকর্মশালার উদ্বোধন করার সুযোগও জুটে যায়। ফটো তোলার আরো অনেক সুযোগ আছে কলকাতায়। কিন্তু দার্জিলিং-এ? থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়। সেই বাজার, মোটর স্ট্যান্ডের পাশে লয়েড জর্জ বোটানিক্যাল গার্ডেনে একদিন ঘুরে-বেড়ান, ন্যাচরাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে গিয়ে বোকার মতো হাঁ করে থাকা, অবজারভেটরি হিলস্-এ গিয়ে ঘোমটা দেওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা।

দার্জিলিং-এ লাটসাহেবের আরো কিছু কম্ম আছে। একদিন লেবং-এর রেস কোর্সে গিয়ে খচ্চরের দৌড় দেখে হাসি মুখে কোনো মাতাল জুয়াড়ির হাতে কাপ-মেডেল তুলে দিতে হয়। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার মতো এগুলো সব লাটসাহেবকেই করতে হয়। সরকারি ভাষায় প্রিসিডেন্ট হয়ে গেছে। প্রিসিডেন্ট-এর মতো কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ছাড়াও লাটসাহেবকে আরো আরো কিছু পূজা-পার্বণ-ব্রত পালন করতে হয় শৈল শিখরে গিয়ে। কোটিপতি পাটের দালালেরা মেয়ের আর্ট একজিবিশন ওপন্ করতে হয়। ইনভিটেশন কার্ডে অবশ্য লেখা থাকে ওপনিং অফ আর্ট সেলুন। একবার-আধবার ক্যাপিট্যাল থিয়েটার বা রিন্‌ক সিনেমায় গিয়ে কিছু ব্যভিচারিণীদের চ্যারিটি শো-তে মদত করতেও হয় লাটসাহেবকে। এসব না করলে বর্ষায় তিস্তা ভদ্র হয়ে উত্তর বাংলার মানুষদের শান্তিতে থাকতে দেবে, এমন কোনো কারণ নেই। তবু করতে হয়। করতে হয় বাজেট বরাদ্দের কয়েক লক্ষ টাকা হরির লুঠের বাতাসার মতো উড়াবার জন্য। হাজার হোক সারা বাংলার জনপ্রতিনিধিদের পাশ করা বাজেটের তো একটা প্রেস্টিজ আছে?

তেনজিং হিমালয়ের ছাদে চড়ার পর সারা দেশের ভি-আই-পিদের মতো লাটসাহেবকেও পাহাড়-প্রেমিক হতে হয়েছে। যে লাটসাহেব দার্জিলিং বা বেনারসের কোনো পুরনো সিঁড়ি দিয়ে দু-ধাপ উঠতে পারেন না, তাঁকে মাউন্টিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপালের তৈরি তিন পাতা টাইপ করা বক্তৃতা রিডিং পড়ে পর্বতারোহণে উৎসাহ দিতে হয় একদল ছেলেমেয়েকে।

আগের দিনে জমিদারবাবুরা আদুরে বারবনিতা গোলাপির বিড়ালের বিয়েতে লক্ষ টাকা ওড়াতেন। একালে লাটসাহেবের ফালতু লাটসাহেবিপনায় লক্ষ লক্ষ টাকা উড়ছে বলেই বোধহয় জমিদারের বিড়ালের বিয়ে বন্ধ হয়েছে।

যে যাই হোক। লাটসাহেব রওনা হবার পনের দিন আগেই অ্যাডভান্স পার্টি চলে গেছে। দার্জিলিং রাজভবনেও বহু ছোট-বড় মাঝারি কর্মচারী আছেন। তাঁরা সব কিছুই জানেন। সবকিছু ব্যবস্থাই করতে পারেন। তবু অ্যাডভান্স পার্টিকে যেতেই হয়। বিড়ালের বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য অ্যাডভান্স পার্টিতে ডেপুটি সেক্রেটারি ও এ-ডি-সি লেফট্‌ন্যান্ট ভাটিয়া আর কিছু অফিস স্টাফ চলে গেছে।

স্বাধীনতার আগে ও পরে শুধু একটি পার্থক্য হয়েছে। সে হচ্ছে হিজ এক্সেলেন্সির সিকিউরিটি। গভর্নরের ডিভ্যালুয়েশনের সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটি ব্যবস্থারও অধঃপতন হয়েছে। একজন ছোকরা সাব-ইন্সপেক্টরই এখন মহামান্য রাজ্যপালের একমাত্র ত্রাণকর্তা। অ্যাডভান্স পার্টিতে তাই কোনো সিকিউরিটি অফিসার থাকেন না।

দিল্লীর কিছু হাফ-গেরস্ত, হাফ-সাহেবরা প্রতি সামারে যেমন অন্তত একবেলার জন্য মুসৌরি

ঘুরে এসে অক্ষয় প্রেস্টিজের অধিকারী হন, কলকাতার কিছু মানুষের মধ্যেও এ রোগ আছে। টাইগার হিলে গভর্নরের মুচকি হাসি না দেখে কলকাতার কিছু মানুষ পার্ক স্ট্রিটের কেক খেতে পারেন না। গভর্নরের অ্যাডভান্স পার্টি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওঁরাও গরম জামা-কাপড় ইস্ত্রি করা শুরু করেন।

ক্যাপ্টেন এসব জানে। জানে আরো অনেক কিছু। জানে অ্যাডভান্স পার্টি চলে যাবার পরই শুরু হবে বিশ্বনিন্দিত কলকাতা রেডিও স্টেশনের অনুরোধের আসর! যে এ-ডি-সি গভর্নরের সঙ্গে যাবার জন্য থেকে যান, তাঁকেই এই অনুরোধের আসরের জ্বালা সহ্য করতে হয়। নিয়মিত, প্রতি বছর। বৈচিত্র্য নেই সে অনুরোধে। তাছাড়া এসব রিকোয়েস্ট আসেও ওই একই অতি পরিচিত মহল থেকে। ওরা উত্তর বা দক্ষিণ কলকাতার লোক নন। মধ্য কলকাতারও না ; কলকাতায় বাস করেও কলকাতাবাসী নন যাঁরা, সেই লাউডন-রডন-ক্যামাক-ময়রা স্ট্রিটের কিছু মানুষের কাছ থেকেই এসব অনুরোধ আসে, আসবে। ওরা সত্যি বিচিত্র! ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের প্লেনে চড়ে কাঠমাণ্ডু যেতে ওদের প্রেস্টিজে লাগে কিন্তু বিলেত-আমেরিকা গিয়েও ভব্য-সভ্য হবার সুযোগ পান না বিশেষ। তবে হাতের কাছে বি-ও-এ-সি বা প্যান-এমের টাইম টেবিল রাখেন প্রায় সবাই। ফিফথ্ এভিনিউ বা অক্সফোর্ড স্ট্রিটে সপিং করার সৌভাগ্য না হলেও নিউ মার্কেটের নিন্দায় পঞ্চমুখ।

ওরা আরো অনেক কিছু। কলকাতায় থেকেও বেলেঘাটা নারকেলডাঙ্গা-উল্টাডাঙ্গা দেখেন না। ওরা জলযোগের পয়োধি পেলেও দূরে সরিয়ে রাখেন কিন্তু ক্রেডিটে ফেরাজিনির কেক না খেয়ে পারেন না। স্বপ্ন দেখেন সুইস আলপস্-এর, যান শুধু দার্জিলিং।

অনুরোধ আসে ওই ওদের কাছ থেকে। প্রস্তাবিত, সম্ভাবিত আক্রমণের জন্য ক্যাপ্টেন রায় প্রস্তুত হচ্ছিল।

এই অনুরোধ-উপরোধ নিয়ে ঝামেলার শেষ নেই। কিছু লোককে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে অসন্তুষ্ট করতে হয় বহুজনকে। এবার তাই ক্যাপ্টেন রায় আগে থেকেই সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলে গভর্নরের কাছেই চলে গেল।

'স্যার! আই অ্যাম সিওর প্রত্যেক বছরের মতো এবারও বহু রিকোয়েস্ট আসবে...'

'ডু ইউ থিঙ্ক সো?'

'ডেফিনিটলি। বহু চিঠিপত্র অলরেডি এসে গেছে। কালকের পেপারে আপনার দার্জিলিং যাবার ডেট অ্যানাউন্স হবার সঙ্গে সঙ্গে পার্সোন্যাল রিকোয়েস্ট আসা শুরু হবে। দ্যাট ইজ হোয়াই...'

'অফিসিয়্যাল প্রোগ্রাম কতগুলো আছে?'

'একটা।'

'ওনলি ওয়ান?' অবাক, বিস্ময়, হতাশায় গভর্নর এ-ডি-সি'র দিকে চাইলেন!

'ইয়েস স্যার।' খুব নরম গরম গলায় ক্যাপ্টেন রায় জানাল।

দার্জিলিং-এ গভর্নর থাকবেন তিন সপ্তাহ আর সরকারি এনগজেমেন্ট মাত্র একটা? হ্যাঁ। ওই রকমই হয়। দিল্লিতে হোম মিনিস্টারের করকমলে প্রতিদিন প্রতি রাত্রি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে ও চীফ মিনিস্টারের সানুগ্রহে গভর্নর হলে এর চাইতে বেশি অনার পাওয়া যায় না। গভর্নর ও তার এ-ডি-সি দু'জনেই একথা জানেন। তাই কেউই আর এ বিষয়ে আলোচনা করলেন না।

'সরকারি প্রোগ্রাম কি?'

'স্যার, টু গিভ অ্যাওয়ে সার্টিফিকেটস টু গ্রামসেভিকাস্।'

মর্মাহত হলেন হিজ এক্সেলেন্সি। যারা বি-ডি-ও'র আন্ডারে চাকরি করবে, তাদের সার্টিফিকেট দিতে হবে ওকে? তবে সান্ত্বনা এই যে ডেভলপমেন্ট কমিশনার তাঁর বক্তৃতায় নিশ্চয়ই বলবেন, গ্রাম বাংলার রূপ বদলাবে তোমরা—ইউ গার্লস। বি কেয়ারফুল, কি দারুণ রেসপন্সিবিলিটি তোমাদের এবং তাইতো হিজ এক্সেলেন্সি ইউ ভেরি কাইন্ডলি প্রেজেন্ট হিয়ার টু-ডে। কলকাতার খবরের কাগজে এ অনুষ্ঠানের রিপোর্ট ছাপা না হলেও পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের কাগজে ছবি ও রিপোর্ট ভালোভাবেই বেরোবে।

সরকারি নেমন্তন্নর অভাবে চুপচাপ তো রাজভনের মধ্যে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকা যায় না। গভর্নর তাই এ-ডি-সি'কে বললেন, 'না, না, ডোণ্ট ডিসঅ্যাপয়েন্ট অল অফ্ দেম্।'

'বাট স্যার, কতজনকে আর খুশি করতে পারব? তাছাড়া ইউ আর গোয়িং দেয়ার টু টেক রেস্ট।'

'নো, নো। পাবলিক রিকোয়েস্ট করলে আই মাস্ট ট্রাই টু অনার দেম।'

কিছু লোকের তৈল মর্দন পাবার জন্য গভর্নর ব্যাকুল ছিলেন। তাছাড়া কোনো ইনভিটেশন না থাকলে ওর ফ্যামিলীর লোকজনই বা ভাববেন কি?

'স্যার সেক্রেটারি ওয়াজ সাজেস্টিং যে ডেইলি একটা এনগেজমেন্ট নেওয়াই ঠিক হবে।'

শেষে গভর্নর জানালেন যে বেশি অনুরোধ-উপরোধ এলে মাঝে-মাঝে দুটো-তিনটে এনগেজমেন্ট থাকলেও আপত্তি নেই।

দারিদ্র্যের প্রতিযোগিতা নেই কিন্তু ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতার শেষ নেই। গ্রীষ্মের দার্জিলিং-এ দেখা যায় সেই প্রতিযোগিতা। কলকাতার ইমপোর্টেড ব্যবসাদার আর লোক্যাল প্লান্টর্সরা পাগল হয়ে ওঠেন নেশায়। মিস এটা সেনের চারটি পেন্টিং কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিল্পপতি সানইয়াল ওর আর্ট সেলুনের ওপেনিং-এ সভাপতির পদ কিনলেন। কেন? চীফ গেস্ট যে গভর্নর। ওভার নাইট সানইয়াল সাহেবকে নিয়ে মেতে উঠলেন সোসাইটি লেডিরা। দার্জিলিং 'সামার কুইন' প্রতিযোগিতায় ওকে চিফ গেস্ট করার প্রস্তাব এলো বহুজনের কাছ থেকে।

মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলের ডাইনিং হলের এসব আলোচনা, জিমখানা ক্লাবের বিলিয়ার্ড রুমে পৌঁছতে দেরি লাগেনি। প্লান্টার্স খৈতান সাহেবদের বাগান কিনে সাহেব হবার চেষ্টা করছেন। তাছাড়া বাপ-দাদা কলকাতার স্টক-এক্সচেঞ্জ আর খিদিরপুরের তিন-চারটে কলকারখানা সামলাতে এত মত্ত যে জুনিয়র খৈতান নতুন বিজনেস সামলাতে এসে প্রমত্ত হবার অফুরন্ত সুযোগ পাচ্ছেন।

ক্যাপ্টেন রায় এইসব নোংরা প্রতিযোগিতার নেপথ্য কাহিনি সব জানে। প্রতিবছর এর পুনরাবৃত্তি হয়। এবার না হবার কোনো কারণ খুঁজে পায়নি ক্যাপ্টেন। তাইতো অনুরোধ আসার আগেই সেক্রেটারি আর হিজ এক্সেলেন্সির সঙ্গে আলাপ করে নিল।

পরের দিন খবরের কাগজে গভর্নরের দার্জিলিং প্রোগ্রাম বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল হাই সোসাইটির পাগলামি। লেটফ্ন্যান্ট ভাটিয়া চলে গেছে। নর্ম্যাল এ-ডি-সি ইন ওয়েটিং-এর কাজ তো আছেই, তারপর সারাদিন এই ঝামেলা। দিনরাত্রি—চব্বিশ ঘণ্টা। তাছাড়া প্রায় রোজই একবার ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে দমদম যেতে হয় কোনো না কোনো গেস্টকে রিসিভ বা সি-অফ্ করতে। এরই ফাঁকে ফাঁকে অতিথিদের দেখাশুনাও করতে হয় ওকেই।

শান্তশিষ্ট ক্যাপ্টেনও যেন মেজাজ হারিয়ে ফেলে। অধিকাংশ গেস্টদের ডিপারচার হচ্ছে ভোরবেলায়। ছটা নাগাদ। পাঁচটায় উঠেই ক্যাপ্টেনকে তৈরি হতে হয় ওদের বিদায় জানাবার

জন্য। তাছাড়া যেখানে বাগের ভয়, সেখানেই রাত হয়। সিঙ্গাপুরে সিয়াটো কনফারেন্সের জন্য ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি, টার্কিশ ডিফেন্স মিনিস্টার, ইটালিয়ান ফরেন মিনিস্টার আর ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার অফ ইরান সিঙ্গাপুরের পথে দমদম হয়ে গেলেন। পরপর তিনদিন মাঝরাতের পর বা শেষ রাতের গভর্নরের পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেনকে অভ্যর্থনা জানাতে হল। সারাদিন পরিশ্রমের পর রাতের ঘুমটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হল।

একদিন মাত্র মিনিট পনেরোর জন্য মণিকাদের ওখানে গিয়েছিল। তাছাড়া রোজ টেলিফোনে কথা বলবারও সুযোগ থাকে না। মণিকাও দুদিন রাজভবনে এসেছিল। দেখা হয়েছিল একদিন।

'কেমন আছ?'

'খুব ভালো।'

ঠোঁটের কোণায় সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে মণিকা বলল, তা আমি জানি। খবরের কাগজের ফ্রন্ট পেজে ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারির সঙ্গে ছবি বেরোচ্ছে, ভালো থাকবে না?"

সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ফেলে ক্যাপ্টেন ওপাশের কৌচটা ছেড়ে মণিকার পাশে এসে বসল। একবার হাসল, একবার চাইল। আলতো করে আঙুল দিয়ে মণিকার আধোবদন তুলে ধরল।

'দারুণ রাগ করেছ, তাই না?'

মণিকা জবাব দিল না। মুখাট আবার নিচে করল।

ক্যাপ্টেন একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'আরতি চলে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

আবার একটু নিস্তব্ধতা।

'আচ্ছা আরতি বোধহয় ঠিক হ্যাপি নয়, তাই না?'

সঙ্গে সঙ্গে মণিকা জবাব দেয়, 'হু ইজ হ্যাপি?'

ডান হাত দিয়ে মণিকাকে কাছে টেনে নিয়ে মুখখানা তুলে ধরে বলে, 'তুমি তো সুখী।'

'ঘোড়ার ডিম।'

'ঘোড়ার ডিম? বলো কি?'

মণিকা কি জবাব দেবে? চুপ করে থাকে।

ক্যাপ্টেন আবার বলে, 'সেদিন রাত্রের পরও তুমি কি একথা বলছ?'

'বলব না? সেদিন রাত্রের পর তুমি আমাকে উপেক্ষা করে চলেছ, আমি সুখী হব না?'

একটু আদর-টাদর করে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ক্যাপ্টেন সেদিন নিজে গিয়ে ছেড়ে এসেছিল মণিকাকে।

রাজভবনে ফিরে এসে চুপচাপ বসে বসে ভাবছিল মণিকার কথা! অনেকক্ষণ, অনেক কিছু। ধীরে ধীরে কত কাছে এসে, কত নিবিড় হয়েছে। কত গভীর হয়েছে, দুটি প্রাণের বন্ধন। প্রথম দিনের প্রথম অধ্যায়ের ইচ্ছা—আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন—সাধনা আজ পূর্ণ। তবুও কেন এই অপূর্ণতার বিস্বাদ? মণিকা কেন এখনও বিবর্ণ? পূর্ণ হয়েও পরিপূর্ণ হয় না কেউ। কেন?

সেন্টার টেবিলে পা দুটো তুলে দিয়ে কৌচে প্রায় শুয়ে পড়ে ক্যাপ্টেন। সিগারেট খেতে খেতে দৃষ্টিটা ঘুরে যায় বাইরের দিকে রাজভবনের চারপাশের শ্যামল সীমান্তে। মাটির তলায় লুকিয়ে থাকে বীজ। অঙ্কুরিত হবার সাধনায় সে উন্মাদ হয়ে ওঠে। একদিন সে সাধনার শেষ হয়। ধরিত্রী বিদীর্ণ করে সে বীজ আত্মপ্রকাশ করে, সূর্যের আলো দেখে সে খুশিতে ঝলমল করে ওঠে কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সে আবার পাগল হয়ে ওঠে। সূর্যের হাসি দেখার পর পরই সদ্য অঙ্কুরিত বীজ চারপাশে দেখে বিরাট বনানী। ওরা সবাই আকাশের কোলে মাথা উঁচু করে

দাঁড়িয়ে দশ দিকে নিজেকে বিস্তারিত করেছে। প্রচার করেছে নিজের সাফল্য, কৃতিত্ব, অস্তিত্ব। ওই বিরাট বনানীর মতো নিজের কৃতিত্ব প্রচারের জন্য সদ্যজাত শিশু—মহীরুহ আবার নতুন নেশায় মেতে ওঠে। ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে আশা—নিরাশা। আকাশের কোলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে শান্তি পায় না ওরা। ফুলে ফলে নিজেকে সাজাতে চায়। চায় আরো কত কি!

প্রকৃতির কি বিচিত্র খেয়াল? গাছপালা পশুপক্ষী মানুষ—সবাই এক সুরে, এক ছন্দে বাঁধা। কেউ থামতে চায় না।

মণিকাও না। এক স্বপ্নের পরিণতিতে জন্ম নিয়েছে নতুন স্বপ্ন, নতুন আশা। নতুন প্রত্যাশা। হয়তো নতুন দাবিও। সে কি অন্যায়?

অন্যায় কেন হবে? তবে এত ব্যস্ততা কেন। এত হতাশ হবার কি আছে?

আপন মনে ক্যাপ্টেন ভাবে। স্বপ্ন কি ওর নেই? মণিকাকে নিয়ে কত কি ভাবে, কত কি আশা করে! কত অপূর্ণ বাসনা চাপা দিয়ে রেখেছে হাসি মুখে। কর্তব্যের আড়ালে, সামাজিক পরিবেশের চাপে।

মণিকাকে কি সব কথা বলা যায়? সারাদিন সবার সঙ্গে ওকে হাসতে হয়, কিন্তু...কিন্তু কি?

ক্যাপ্টেন মণিকার কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ে। উৎকণ্ঠাভরা আরো একটা দিনের শেষ হয়।

দিন ফুরিয়ে যায় কিন্তু উৎকণ্ঠা? চিন্তা? ব্যথা—বেদনা, হতাশা? সব লুকিয়ে থাকে। চাপা থাকে।

সব কিছু চাপা দেবার জন্যই তো এলাহাবাদ ছেড়ে পালিয়েছিল। ভেবেছিল দৈনন্দিন জীবনেরা উত্তেজনায় ভুলতে পারবে সেই অবিস্মরণীয় নাতিদীর্ঘ ইতিহাস। ভেবেছিল মত্ত—প্রমত্ত থাকবে। দিনের বেলায় কাজের নেশায়, রাত্রে অফিসার্স ক্লাবে, বারে। বোতল বোতল হুইস্কি গলা দিয়ে ঢেলে মুছে ফেলবে সব স্মৃতি।

পারেনি। বহু চেষ্টা করেও পারেনি। প্রথম প্রথম অনেক দূর এগিয়েছিল। পরে ফিরে এসেছে। ও পথ ছেড়ে দিয়েছে। পুরনো বন্ধুরা তো ক্যাপ্টেন রায়কে দেখে অবাক হয়। চব্বিশ ঘণ্টা সিগারেট খাবে কিন্তু কোনো অকেশন না হলে এক পেগও খাবে না।

কি করে ক্যাপ্টেন? হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মা ওর দুটি হাত ধরে অনুরোধ করেছিলেন?

অনুরোধ?

না, না। ওকে কি অনুরোধ বলে? দুই হাত ধরে ভিক্ষা চেয়েছিলেন মা। জননী। গর্ভধারিণী। চির কল্যাণী, চির শুভাকাঙ্ক্ষিনী।

‘তুই নিজেকে যদি অমন শেষ করে দিস তাহলে আমি কি নিয়ে বাঁচব বল তো?’

প্রয়াগ সঙ্গমের ধারে হনুমানজীর মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মা-র পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল ক্যাপ্টেন। পরে মনে মনে বলেছিল, আমার জন্য আর ওই হতভাগিনীকে চোখের জল ফেলতে হবে না। না। কোনোদিন না। এই পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আর কে আমার জন্য এমন করে...

রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও মনে পড়ছিল সেই সর্বনাশা দিনগুলোর কথা। স্মৃতি। বেদনা।

মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্তে মনটা আরও পিছিয়ে যেতে চায়। ভয়ে আঁতকে ওঠে। পারে না। রাগে, দুঃখে, ঘেন্নায় সারা শরীরটা জ্বলতে থাকে। একটা অব্যক্ত বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বহুকাল ভুলে ছিলেন। নিজের কথা চিন্তাই করতেন না

ক্যাপ্টেন। দিনরাত্রির লীলাখেলার মধ্য দিয়ে শ্লথ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিলেন অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। সে ভবিষ্যতের কাছে কোনো প্রত্যাশা ছিল না ওর, কেন দাবি ছিল না, দিনের আলোয় কোনো স্বপ্ন জন্ম নিত না, রাত্রের অন্ধকারে কোনো স্বপ্ন মিলিয়েও যেত না।

বেশ ছিলেন ক্যাপ্টেন। কলকাতায় এসেও বেশ ছিলেন। আমজাদ রমজানের কাছে গল্প শুনে বেশ কাটছিল দিনগুলো। কোনো শূন্যতা অনুভব করতেন না। রাত্রে ঘুম ভেঙে যেত না কোনো দিন। বৈভব তীর্থ গভর্নমেন্ট হাউসে থেকেও বেশ নিরাসক্ত ছিলেন ক্যাপ্টেন রায়।

প্রলোভন যে আসেনি, তা নয়। এসেছে। কখনও মিস গুপ্তা বা মিসেস রায়চৌধুরির কাছ থেকে, কখনও আবার কোনো অতিথিনীর কাছ থেকে। আরো কত জায়গা থেকে। মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে গেছেন ক্যাপ্টেন। মনে কোনোদিন আলোড়ন আসেনি। উত্তাপ বোধ করেছেন মনে মনে কদাচিৎ।

কিন্তু হঠাৎ সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। প্রথমে মনে হয়েছিল।

"A gentle shock of mind surprise.
Has Carried far into his heart the voice
Of mountain torrents."

একটু পরে আবার সহেন্দহ দেখা দিয়েছিল। তবে কি—

"Two lovely black eyes,
Oh, what a surprise!
Only for telling a man he was wrong,
Two lovely black eyes!"

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ঠিক, নাকি চার্লস কোবর্ণ? বিচার করতে পারেনি ক্যাপ্টেন। সার্জেন যেমন সবার অপারেশন করতে পারেন কিন্তু নিজের স্ত্রী? ছেলেমেয়ের? পারেন না। কেন ডাক্তাররা? নিজের চিকিৎসা কখনও করেন না, করতে পারেন না। ক্যাপ্টেনও পারেননি। কে ঠিক? কোনটা ঠিক?

তিনি শুধু জানলেন অজ্ঞাতসারেই নিজের হাতেই গাড়ির স্টিয়ারিংটা ঘুরে গেল। কেন, কেমন করে? জানেন না। জানবার প্রয়োজন বোধ করেননি। বহুদিন জানতে চান কি। কি প্রয়োজন? কি সার্থকতা? জীবনের সব প্রশ্নের কি উত্তর পাওয়া যায়? কেউ পায়নি, কেউ পাবে না। যৌবনেই জীবনের এই মর্মকথা জেনে গেছেন ক্যাপ্টেন। নিজের জীবন নিয়ে মর্মে মর্মে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন যে!

মণিকা অভিমান করেছে। হয়তো রাগও। কিন্তু ক্যাপ্টেন কি করে বোঝাবেন সব কথা? রেসের ঘোড়ার মতো দৌড়তে চাইলেই কি তা সম্ভব? বিধাতা-পুরুষ ক্যাপ্টেনের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। তিনি তো চাননি কারুর জীবন নিয়ে খেলা করতে। মণিকাকে নিয়েও নয়। কখনই নয়। যে সম্মান, ভালোবাসা, ঐশ্বর্য মণিকা ওকে দিয়েছে, তা নিয়ে কি খেলা করা যায়? আর কেউ পারলেও ক্যাপ্টেনের সে ক্ষমতা নেই, ইচ্ছাও নেই।

মণিকা নিশ্চয়ই একটু আহত মন নিয়ে ফিরে গেছে কিন্তু তিনি তো চাননি ওর ভালোবাসার অমর্যাদা করতে, চাননি ওকে আহত করতে। সেকথা বোঝাবেন কেমন করে। বরং ক্যাপ্টেন স্বপ্ন দেখেন মণিকাকে সসম্মানে ওর জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে।

তাছাড়া মণিকার কাছে ক্যাপ্টেন কৃতজ্ঞ। অশেষ কৃতজ্ঞ। বহুদিন ধরে মহাশূন্যে বিচরণ করার পর মণিকাই ওকে ফিরিয়ে এনেছে এই পৃথিবীতে। প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতার রাজ্যে। দেহ ছিল কিন্তু তার চাইতে বেশি ছিল দাহ। মণিকাই মুক্তি দিয়েছে সে দাহ থেকে, সে অব্যক্ত অসহ্য বেদনা থেকে।

আরও অনেক কিছু দিয়েছে মণিকা। মানুষকে আর পৃথিবীতে নতুন করে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। ক্যাপ্টেন তো নিজেকেও ভালোবাসতে ভুলে গিয়েছিল। আজ সে নিজেকে ভালোবাসে। সকালবেলায় তাইতো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাক ব্র্যাশ করতে করতে গান গায়, 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে...'

আগে?

ইউনিফর্ম চাপিয়েই ক্যাপ্টেন খুশি থাকতো। কসমেটিক্স তো দূরের কথা, মাসের পর মাস আফনার সেভ লোশন পর্যন্ত কিনতে ভুলে যেত।

মনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, জীবনের প্রতি মুহূর্তের আশা-ভরসা, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে ক্যাপ্টেন আজ অনুভব করে মণিকাকে। মণিমালাকে?

মণিমালা?

'হ্যাঁ, মণিমালা। ক্যাপ্টেনের খুব বেশি অভিব্যক্তি নেই কিন্তু তাই বলে তার স্বপ্ন নেই? যেদিন মণিকাকে ও কাছে পাবে, নিজের করে পাবে, ফুলের জলসায় নীরব কবির মতো সলজ্জভাবে আসন্ন সম্ভাবনাপূর্ণ মুহূর্তের জন্য প্রতিক্ষা করবে, সেদিন থেকে ক্যাপ্টেন তো ওকে মণিমালা বলেই ডাকবে।

ক্যাপ্টেন জানে মণিকার কথা মাকে জানালে তিনি খুশি হবেন। নিশ্চিত হবেন। খুশি হবেন এই কথা ভেবে যে তাঁর একমাত্র পুত্র সুস্থ স্বাভাবিক হয়েছে। নিশ্চিন্ত হবার কারণও অনেক। এক মুহূর্তে একটা বুলেটের গুলিতে যে সুখের সংসারটা ছারখার হয়ে গিয়েছিল ক'বছর আগে, সে সংসার হয়তো সুখের, শান্তির হবে। এই ক'বছরের অস্বাভাবিক চাপা উত্তেজনাটা বিদায় নেবে। নিশ্চিন্ত হবেন না?

তাছাড়া একমাত্র ছেলে আর্মিতে, তাতেই মার ঘুম নেই। মার ধারণা যেখানেই যুদ্ধ-বিগ্রহ বা মারামারি কাটাকাটি হোক, তাঁর ছেলেকেই সব কিছু সামলাতে হবে। আর দিন-রাত্রির অত-শত বিপদের মধ্যে থাকলে কখন কি হয় বলা যায়? একে অমন চাকরি তার উপর সংসারধর্ম করল না। করতে পারল না। চিন্তার শেষ নেই মার।

মণিকার কথা জানলেই হল। হয়তো পরের ট্রেনেই ছুটে আসবেন। কিছু বলা যায় না। মণিকাকে দেখলে মার-র মাথার ঠিক থাকবে কিনা, তাই বা কে জানে? হয়তো মণিকারই হাত দুটো ধরে কাঁদতে কাঁদতে ভিক্ষা চাইবেন তাঁর ছেলেকে বাঁচাবার জন্য। আরো কত কি করবেন, কে বলতে পারে?

তাছাড়া কিচ্ছু না জানিয়েও যদি মণিকার সঙ্গে মার আলাপ করিয়ে দেওয়া যায় তাহলেও হয়তো মা প্রস্তাব না করে পারবেন না। অমন শান্ত–স্নিগ্ধ অথচ সুন্দরী মেয়েকে দেখলেই মার পছন্দ হবেই। আর পছন্দ হলে নিশ্চয়ই...

গান শুনলে? মণিকা যদি 'আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব' শোনায়? মা সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, শেষের লাইনটা আর একবার কর না মা। বড় ভালো লাগে ওই কটি কথা! এই বলে হয়তো নিজের মনে মনেই আবৃত্তি করবেন–

'আমার শুধু একটি মুঠি ভরি
দিতেছ দান দিবস–বিভাবরী–
হল না সারা, কত না যুগ ধরি
কেবলই আসি লব।'

ক্যাপ্টেন অনেকবার ভেবেছে মাকে সব কিছু জানাবে, কিচ্ছু লুকোবে না। দু'একবার চিঠি লেখার কাগজপত্র নিয়েও বসেছিল! শেষ পর্যন্ত লেখেনি। লিখতে পারেনি। নিজেকে বিচার করতে চেয়েছিল ভালোভাবে। বিচার করতে চেয়েছিল, কোনো মোহের ঘোরে ও মণিকাকে চাইছে না তো? একটু মোহ আছে বৈকি। হাজার হোক মণিকাকে দেখে, আলাপ করে, এত নিবিড় ভাবে মেলামেশা করে নিশ্চয়ই কিছুটা মোহ জন্মেছে কিন্তু শুধুই মোহ নয় তো? আপন মনে বিচার করতে গিয়ে ক্যাপ্টেন চিঠিপত্র লেখার কাগজপত্তর সরিয়ে রেখেছে। নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে। আরো ভালোভাবে নিজের মনকে, নিজের সত্তাকে বিচার করতে চেয়েছে। পরীক্ষা করতে চেয়েছে মণিকার প্রতি তার ভালোবাসা।

হয়তো মণিকাকেও পরীক্ষা করতে চেয়েছে! আর্মি অফিসারদের প্রতি কিছু মেয়ের মোহ থাকে, আকর্ষণ থাকে। দুর্বলতাও থাকতে পারে। দুনিয়ার সবার থেকে নিজেকে একটু স্বতন্ত্রভাবে দেখার লোভ কোনো মেয়েই সামলাতে পারে না। সর্বত্র, সব পরিবেশেই। কুলি-মজুর, কেরানী-অফিসার, বীমার দালাল, বিজনেসম্যান যাকেই বিয়ে করুক না কেন, বিয়ের পর মেয়েরা অনন্যা হয়ে ওঠে। গভর্নরের এ-ডি-সি-কে বিয়ে করে সে হয়তো সেই আত্মতৃপ্তি একটু বেশি করে উপলব্ধি করার প্রয়াস পারে। এ-ডি-সি-র প্রতি আকর্ষণ হবার আরো অনেক কারণ আছে। যুক্তিতর্কে সে কারণ না টিকলেও আছে। থাকে। ক্যাপ্টেন তা জানে। বুঝতে পারে। মণিকাও সেই মরীচিকার মোহে এগিয়ে আসেনি তো? যৌবনের মোহনায় দাঁড়িয়ে জোয়ারের টানে কিছু দূর ভেসে যেতে চায়নি তো? উত্তাল উন্মত্ত যৌবনের মোহনা থেকে দূরে এসে ভাঁটার টানেও মণিকা ভালোবাসবে তো? নিজের মনপ্রাণ সত্তা দিয়ে ক্যাপ্টেনের কল্যাণ চাইবে তো?

ক্যাপ্টেন এখন নিশ্চিন্ত। মণিকাকে নিয়ে মনের দ্বন্দ্ব, শঙ্কা ভালোভাসার পলিমাটির তলায় বহুদিন আগেই চাপা পড়েছে। ওকে না পাবার জন্য মণিকার মনে অব্যক্ত ব্যথা, শূন্যতা ক্যাপ্টেন বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে। বেশ লাগে। এতকাল তো ওর জন্য কেউ এমন শূন্যতা অনুভব করেনি। ভালো লাগবে না?

ক্যাপ্টেন নিজেও তো ওই একই ব্যথা বেদনা শূন্যতা অনুভব করছিল। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে। রাজভবনের আকর্ষণ, সোসাইটির গ্ল্যামার, লাঞ্চ-ডিনার—কক্‌টেলের হাসিঠাট্টাতেও নিজেকে ভরিয়ে তুলতে পারছিল না। বড় বেশি অপূর্ণ, অসম্পূর্ণ মনে হচ্ছিল। সবকিছু পেয়েও যেন ওর অভাব মিটছিল না। কিছুতেই না।

অ্যাডভান্স পার্টি চলে যাবার পর কয়েকটা দিন অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। তারপর যখনই একটু সময় পেল, কাগজপত্র নিয়ে বসল মাকে চিঠি লিখতে। আর দেরি করতে পারল না, চাইল না।...মা'র জ্বর হলে, সদ্যজাত শিশুরও জ্বর হয়, সর্দি লাগে। আজ আমি বড় হয়েছি। তোমার জ্বর হলে সর্দি লাগলে আমার হয় না। হতে পারে না। তোমার দুধ খেয়ে, কোলে চড়ে আমি বড় হয়েছি। আর ধীরে ধীরে জন্ম নিয়েছে আমার স্বতন্ত্র সত্তা। জন্ম নিয়েছি আবার আমি। দূরের মানুষের কাছে আমি একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষ। একটা পরিপূর্ণ সত্তা। কিন্তু তা কি হয়? সে কি সম্ভব। আজ আমার মুখে হাসি না দেখলে তোমার মুখে হাসি ফুটবে না, আমার দুঃখে তোমার চোখের জলের বন্যা বইবে। আমার মনের শূন্যতায় তোমার মনপ্রাণ হাহাকার করে। এসব তো আমি জানি। তাইতো তোমার মুখোমুখি হতে আমার এত ভয়, এত দ্বিধা।

আমি নিরুপায় হয়ে অদৃষ্টের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভাবতে পারিনি তোমার

চোখের জল মোছাতে পারব, মনের শূন্যতা, হাহাকার দূর করতে পারব। বহুদিন বহু বছর ভাবতে পারিনি। কলকাতা এসেও না। কিন্তু–

এতক্ষণ বেশ লিখছিল। এবার ক্যাপ্টেন একটু থামল। একটা সিগারেট ধরাল। দু-একবার টান দিল। একটু ভাবল, একটু হাসল।

একটু লজ্জা করল নাকি।

হয়তো হবে। মা-র কাছে আবার লজ্জা কিসের? তাছাড়া অমন মা কজনের হয়?

সিগারেটটা অর্ধেক না খেয়েই ফেলে দিল। আবার লিখতে শুরু করল।

...তোমার অব্যক্ত ইচ্ছায় যে আমার জীবনটা এমন মোড় ঘুরবে ভাবতে পারিনি। প্রথমে বেশ কিছুকাল দ্বিধা ছিল, সঙ্কোচ, সন্দেহ ছিল। দীর্ঘদিন ধরে আপন মনে বিচার করেছি। তবুও মনে হচ্ছে, না জীবনটা সত্যিই মোড় ঘুরছে, মনে হচ্ছে মণিকাকে নিয়ে নতুন জীবন সম্ভব হতে পারে।

মণিকার সম্পর্কে তোমাকে বেশি কিছু লিখব না। তুমি নিজে এসে দেখবে, বিচার করবে। আমার দৃষ্টি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই তোমার দেখার শুরু হবে। আমার অদেখা, অজ্ঞাত তুমি দেখতে পারবে, জানতে পারবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই গভর্নর দার্জিলিং যাচ্ছেন। আমিও ওর সঙ্গে যাব তবে দু' একদিন পরেই ফিরব। কলকাতা দিয়ে অনেক ভি-আই-পি যাতায়াত করবেন এর মধ্যে। ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি ও আরো দু'একজন হয়তো এক রাত্রি রাজভবনের থাকতেও পারেন। সেজন্য আমাকে এখানে থাকতে হবে। তুমি ওই সময় এসো। মণিকাদের ওখানেই তোমার থাকার ব্যবস্থা করব। ওর বাবা ডক্টর ব্যানার্জি ও মিসেস ব্যানার্জি নিশ্চয়ই খুশি হবেন।

একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি। মনে মনে দু'জনেই অনেকটা এগিয়েছি। তবুও আমি কোনো পাকা কথা দিইনি, দিতে পারিনি। আর কাউকে না হোক মণিকাকেই তো সব কথাই বলতে হবে। আমার পক্ষে সেসব কথা বলা অসম্ভব। কোনোদিন কাউকে আমি ওই কাহিনি বলতে পারব না। সব কিছু শুনেও যদি ও রাজি হয় তাহলে ডক্টর ব্যানার্জি ও তাঁর স্ত্রীকে বলা ভালো হবে।

মণিকা জানতে পারল না এই চিঠির কথা। ক্যাপ্টেন কিচ্ছু বলল না। দার্জিলিং যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ কাটিয়েছিল ওদের ওখানে। খাওয়া-দাওয়ার আগে ঘণ্টা খানেকের জন্য দু'জনে একটু ঘুরতেও গিয়েছিল।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবে?'

'যেখানে খুশি।'

'কোথায় গেলে তুমি খুশি হবে?'

'আমাকে খুশি করার জন্য তোমার এত চিন্তা?'

ক্যাপ্টেন সেকেন্ড গিয়ার দিয়ে একটু হাসতে হাসতে জানতে চাইল, 'তোমাকে খুশি করার জন্য আমার একটুও চিন্তা নেই?'

মণিকাও হাসল। অভিমান-মেশা সামান্য বিদ্রুপের হাসি। 'আমাকে সুখী করা ছাড়া তোমার আর কি চিন্তা?'

ক্যাপ্টেনের কাছে মণিকার অনেক আশা, অনেক দাবি। সে আশা, সে দাবি মেটাতে পারছে না ক্যাপ্টেন। মণিকা যেন আর সহ্য করতে পারে না। অভিমান তো হবেই। হয়তো দুঃখও। লুকিয়ে লুকিয়ে দু'ফোঁটা চোখের জলও পড়তে পারে। মণিকার কথায় ইঙ্গিত পায় ক্যাপ্টেন।

থার্ড গিয়ার দিয়েই স্পীড দেয় না ক্যাপ্টেন। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে আরেক হাতে একটা সিগারেট বের করে দুটি ঠোঁটের মাঝে নেয়। নিউ আলিপুর ছাড়িয়ে বড় রাস্তা এসে গেছে। মিন্টটা একটু দুরেই। ক্যাপ্টেন দু'একবার চাইল মণিকার দিকে।

'খুব রাগ করেছ?'

'কার ওপর রাগ করব?'

'তোমার এই ড্রাইভারের ওপর।'

'তোমার ওপর রাগ করবার কি অধিকার আমার?'

'সে প্রশ্নের জবাব পরে দেব! আগে স্বীকার কর রাগ করেছ।'

'বিন্দুমাত্রও না।'

'তবে যে লাইটারটা জ্বেলে ধরছ না?'

মণিকা সত্যি এবার লজ্জা পায়। প্রফেসর মণ্ড চুরুট মুখে দিলেই ও লাইটার জ্বালত। বেশ লাগত। ডক্টর ব্যানার্জির ওসব নেশাফেশা নেই, মণিকার লাইটার জ্বালার নেশাটাও বন্ধ ছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে কাছে পাবার পর থেকেই আবার শুরু করেছিল। ক্যাপ্টেন সিগারেট তুলতে না তুলতেই মণিকা লাইটার জ্বেলে ধরত। অভিমানী মন খেয়াল করেনি ক্যাপ্টেনের মুখে সিগারেট। অভিমানী হলেও সে তো ওকে অবজ্ঞা করতে চায়নি।

মণিকা সঙ্গে সঙ্গে ত্রুটি স্বীকার করল, 'সরি, ক্ষমা কোরো।'

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে মণিকার মুখের 'পর ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ফাইনাল বিচারের রাত্রি সমাগতপ্রায়'। তখনই তোমার বিচার হবে।'

ঠিক বুঝতে পারে না মণিকা। 'তার মানে।'

'একটু ধৈর্য ধর।'

বেহালা-ঠাকুরপুকুর পার হয়ে চলে গিয়েছিল ওরা। ড্যাসবোর্ডের আবছা আলোয় মণিকাকে বারবার দেখছিল ক্যাপ্টেন। লুকিয়ে লুকিয়ে আড়চোখে।

হঠাৎ ধরা পড়ে মণিকার কাছে। 'অমন করে বারবার কি দেখছ?'

'তোমাকে?'

'আমাকে কোনোদিন দেখনি?'

'নিশ্চয়ই দেখেছি।'

'তবে আবার অমন করে দেখছ কেন?'

'দেখছি তুমি আরো কত সুন্দর হয়েছ'।

'ঠাট্টা করছ?'

'ঠাট্টা করব কেন?'

না, না। আর পারে না ক্যাপ্টেন। বাঁ হাতটা দিয়ে মণিকার একটা হাত চেপে ধরে। একটু চাপ দেয়। একবার তুলে নিয়ে নিজের মুখের পর দিয়ে বুলিয়ে নেয়। আর্মি অফিসারের পোশাক পরেও ক্যাপ্টেনের মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। একটু যেন অসংযত হয় মন।

'তুমি জানো না মণিমালা, তুমি আমার কি উপকার করেছ...'

মণিকা অবাক না হয়ে পারে না, 'মণিমালা? মণিমালা কে?'

বলতে চায়নি, হঠাৎ মুখ থেকে ফসকে বেরিয়ে গেছে।

'কে আবার? তুমি।'

'কই কোনোদিন তো মণিমালা বলে ডাকতে শুনিনি।'

'ভেবেছিলাম তোমার-আমার জীবনের সব চাইতে স্মরণীয় রাত্রিতে তোমার নতুন নামকরণ করব।'

মণিকা নিশ্চয়ই মনে মনে খুশি হয়। আপনমনে কি যেন ভাবে। হয়তো ভবিষ্যৎ জীবনের একটু হিসাব-নিকাশ করে নেয়।

স্লো-স্পিডে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। এক হাতেই ক্যাপ্টেন স্টিয়ারিং ধরে আছে। দু'এক মিনিট কেটে গেল।

মাণিক চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি?'

'মিথ্যার' পর ভিত্তি করে তো তোমাকে পেতে চাই না। সব সত্য জানিয়েই তোমাকে চাইব।'

'তার মানে?'

'আমার সব কথা তোমাকে জানাব না?'

'কেন আমি কি সব কিছু জানি না?'

'আমি জোচ্চর-লম্পটও তো হতে পারি।'

মণিকা রেগে যায়। 'বাজে বকো না।'

দু'জনের কেউই আর এগোয়নি। গাড়ি ঘোরাবার পরই কথার মোড় ঘোরাল ক্যাপ্টেন। 'আচ্ছা তুমি আমজাদ-রমজানকে কি বলেছ?'

'কি বলেছি?'

ক্যাপ্টেন সরাসরি সে কথার জবাব দেয় না। একটু হাসে। একবার ভালো করে মণিকাকে দেখে। 'আমি সিগারেট খেতে খেতে ঘুমোই বলে এত দুশ্চিন্তা?'

মণিকা জবাব দেয় না।

বাঁ হাত দিয়ে ক্যাপ্টেন মণিকাকে একটু কাছে টেনে নেয়। মণিকা আপত্তি করে না। 'আমার জন্য তুমি এত ভাব?'

একটু চুপ করে থেকে মণিকা বলে, 'শুধু আমি কেন? আরো অনেকেই নিশ্চয়ই ভাবেন।'

'অনেককেই আর কোথায় দেখলে?'

এত কথা হল কিন্তু চিঠির কথা বলল না ক্যাপ্টেন। রাত্রে খেতে বসে মণিকার মাকে বলল, 'মাসিমা, এবার বোধহয় আমার মা আসছেন।'

'কবে আসছেন?'

'ঠিক জানি না তবে দু'এক উইকের মধ্যেই।'

মণিকা শুধু শুনল। কিচ্ছু বলল না।

ডক্টর ব্যানার্জি জানতে চাইলেন, 'তোমার বাবাও আসছেন?'

বাবা যে কোনোদিন তাঁর পুত্রের সামনে দাঁড়াতে পারবেন না, সে কথা কি বলতে পারে? 'না। এখন তো ওঁর হাইকোর্ট খোলা।

মিসেস ব্যানার্জি বললেন, 'তোমার মা'কে আবার রাজভবনেই তুলো না যেন। আমাদের এখানেই...'

'তুমি বরং কালকেই ওর মাকে একটা চিঠি লিখে দিও।'

স্বামীর প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন মিসেস ব্যানার্জি।

মনে মনে খুশি হলেও ক্যাপ্টেন বলল, 'না, না, ওসব ঝামেলার কি দরকার। মা আমার ওখানেই থাকবেন!'

প্রতিবাদ করলেন ব্যানার্জি-দম্পতি, 'এতে আবার ঝামেলার কি আছে?'

ওদের সামনে বেশ গাম্ভীর্য বজায় রাখলেও হঠাৎ ক্যাপ্টেনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কিন্তু মণিকা কি তা পছন্দ করবে?'

জবাব দেবে কি মণিকা? লজ্জায় জিভ কেটে তাকাল ক্যাপ্টেনের দিকে। ব্যানার্জি-দম্পতিও দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

কি আর করবে ক্যাপ্টেন? একটু স্বাভাবিক হবার জন্য মণিকার মাকে বলল, 'আচ্ছা মাসিমা, তিনজন নিয়েই তো আপনার সংসার। আপনি আর মেসোমশাই মাকে এখানে থাকার কথা বললেন অথচ মণিকা একটা কথা বলল না...'

আর মণিকা চুপ করে থাকে না। 'রাজভবনের স্টাফদের সবাই কি মিন-মাইন্ডেড হয়?'

পরের দিনই ক্যাপ্টেন গভর্নরের সঙ্গে দার্জিলিং চলে গেল। লেফটন্যান্ট ভাটিয়াকে গভর্নরের সব প্রোগ্রাম বুঝিয়ে দিয়েই ক্যাপ্টেন ফিরে এলো তিন দিনের দিন।

ফিরে এসেই ডাক দেখল। মা-র চিঠি না দেখে মনে একটু খটকা লাগল ক্যাপ্টেনের। তবে কি মা-র মত নেই? না, না, তা কেমন করে হয়? আমার মা-কে আমি চিনি না? তবে কি মা অসুস্থ? নাকি বাবাকে নিয়েই আবার কিছু হল?

সেই ঘটনার পর বাবার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই ক্যাপ্টেনের। নববর্ষ-বিজয়ার পোস্টকার্ডও আসে না, যায় না। মা-র চিঠিতে অনেক কথা, অনেক খবর থাকে কিন্তু বাবার বিষয়ে কিচ্ছু লেখেন না। তাইত বার বার ভাবছিল বাবাকে নিয়েই আবার কোনো ঝামেলা হল নাকি?

অন্যান্য চিঠিপত্র পড়তে না পড়তেই টেলিফোন এলো। গভর্নমেন্ট হাউস পি-বি-এক্স থেকে অপারেটর ফোন করছে। 'স্যার গতকাল এলাহাবাদ থেকে ট্রাংকল এসেছিল...'

অপারেটরকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করল, কলিং পার্টি কে ছিল?'

'আপনার মা।'

'মা?'

'ইয়েস স্যার।'

'কি বললেন?'

'আমি বলছি আপনি আজ ফিরবেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

খবরটা শুনে মনটা অনেক আশ্বস্ত হল কিন্তু শরীরটা ঠিক ভালো লাগছিল না। ভীষণ মাথা ধরেছিল। সারা গা-হাত-পা কেমন ব্যথা লাগছিল। এক কাপ কফি আর একটা স্যারিডন ট্যাবলেট খেয়ে একটু শুয়ে পড়ল। একটা সিগারেটও ধরাল। দু'চার টান দেবার পর আর সিগারেট খেতেও ইচ্ছা করল না। ফেলে দিল। ঘুমিয়ে পড়ল।

একটা নতুন বেয়ারা ডিনার এনে দরজা নক্ করল কয়েকবার। কোনো জবাব পেল না। ফিরে গেল। ট্রে ভর্তি ডিনার নিয়ে ফিরে যেতে দেখে আমজাদ জিজ্ঞাসা করল, 'সাব নেই হ্যায় কামরামে?'

'বোধহয় না। নক্ করেও জবাব পেলাম না।'

আমজাদের সন্দেহ হল। এইতো একটু আগেই দার্জিলিং থেকে ফিরলেন। আবার এক্ষুনি বেরিয়ে যাবেন? এ-ডি-সি সব বাইরে গেল আমি তো দেখতে পেতাম। আমি দেখতে না পেলেও আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলে যেতেন।

'চলিয়ে মেরে সাথ। সাব শো গ্যায়া হোগা।'

আমজাদ নক্ করেও জবাব পেল না। তারপর হাতলটা ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। সব টায়ার্ড হয়ে শুয়ে পড়েছেন।'

নতুন বেয়ারাটা টেবিলে খাবার রাখল। আমজাদ আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, 'সাব, সাব!'

ক্যাপ্টেন অঘোরে ঘুমুচ্ছে!

আমজাদ আবার ডাকল, 'সাব, খানা তৈয়ার হ্যায়। সাব!'

ওরা জানে ক্যাপ্টেনের ঘুম খুব পাতলা। একবার ডাকলেই উঠে পড়েন। শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো? সন্দেহ হল আমজাদের। আরো কয়েকবার ডাকল! তারপর একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই এ-ডি-সি সাহেবের কপালে হাত দিল আমজাদ। আপন মনেই বলে উঠল, 'সাব কা বুখার হুয়া।'

দার্জিলিং কলকাতার ঠাণ্ডা গরমে এমন হতেই পারে। দু'তিনদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যায় কিন্তু ক্যাপ্টেন সাহেবকে তো দু'তিনদিন শুয়ে থাকলে চলবে না। অনেক ভি-আই-পিকে তার রিসিভ—সি-অফ করতে হবে। আমজাদ ভেবে-চিন্তে ডাক্তার সাহেবকে খবর দিল।

ডাক্তার সাহেব একটু পরেই এলেন। ভালোভাবেই দেখলেন। না বুকে কোনো কমপ্লিকেশন নেই। সাডেন চেঞ্জ অফ ক্লাইমেট হয়েছে।

ক্যাপ্টেন বললে, 'কি কাণ্ড বলুন তো! এত রাত্তিরে আমজাদ আবার আপনাকে ডিসটার্ব করল!'

'না, না। ডিসটার্বের কি আছে?' একটু হেসে বললেন, 'একটা ক্যাপসুল পাঠিয়ে দিচ্ছি একটু কিছু খাবার পর ওটা খেয়ে শুয়ে পড়ুন। কাল সকালে আবার আসব।'

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল টেলিফোনের রিং শুনে। রিসিভারটা তুলতেই অপারেটর বলল, 'স্যার, ট্রাংকল ফ্রম এলাহাবাদ।'

অনেক দিন বাদ মা-র সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল। জানালেন, মণিকার মা-ও একটা সুন্দর চিঠি লিখেছেন। কালই জবাব দিয়েছি, হয়তো আজই পাবেন।

'তুমি কি আসছ?'

'আসব না? আজই বোম্বে মেলে রওনা হচ্ছি তুই হাওড়ায় থাকবি তো?'

ক্যাপ্টেন মজা করে বলল, 'আমাকে স্টেশনে যেতে হবে?'

'বাঁদরামি করিস না...'

এলাহাবাদ ট্রাংক-অপারেটর জানাল, 'টাইম ইজ ওভার।'

মা-র সঙ্গে কথা বলার পর ক্যাপ্টেনের খেয়াল হল, শরীরটা ঝরঝরে হয়েছে। মনেই হচ্ছে না গতকাল অসুস্থ ছিল। তাছাড়া মা-র আসার খবর পেয়ে যেন মনটাও বেশ খুশিতে ভরে গেল।

ক্যাপ্টেন উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়াল। ঝুঁকে দেখল গাছপালার পাতায় পাতায় সূর্যের আলো লুকোচুরি খেলছে। সামনের লতায় পাতায় শিশির খুঁজে না পেলেও রাত্রির শান্তি তখনও

দিনের কল্লোলে একেবারে হারিয়ে যায়নি।

একটু জোরে জোরে নিশ্বাস নিল। বুকটা জুড়িয়ে গেল। গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া যে তখনও কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের দীর্ঘঃনিশ্বাসের ভয়ে পালিয়ে যায়নি। বেশ লাগল।

বাতাস যেন ওর কানে কল্যাণের আগমনী বার্তা পৌঁছে দিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ক্যাপ্টেন মনের আনন্দে দু' লাইন গানও গাইল—'অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে, সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয় মাঝে। অরূপবীণা...'

তাইতো! মণিকা বা মাসিমাকে তো বলা হল না মা আসছেন। আসছেন মানে? আজই বোম্বে মেলে রওনা হচ্ছেন।

'জানো মণিমালা, এক্ষুনি মা ট্রাংক কল করেছিলেন।'

'কি ব্যাপার?'

'তোমাকে দেখতে আসছেন...'

'সত্যি?' বলে ফেলেই বোধহয় মণিকার ভীষণ লজ্জা হল। হয়তো এমন করে আগ্রহ দেখান ঠিক হয়নি। হয়তো বাবা-মা কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। 'দাঁড়াও খবরটা মা-কেও দিচ্ছি।

খবরটা শুনে মণিকারও মাও খুশি হলেন। সত্যিই যে খুশি হয়েছিলেন, তা বোঝা গেল পরের দিন সকালে হাওড়া স্টেশনে।

ক্যাপ্টেন বেশ খানিকটা আগেই স্টেশনে পৌঁছেছিল। দমদমে একজন গেস্টকে সি-অফ করে সোজা এসেছিল। ফুল ইউনিফর্মে। সঙ্গে তকমা আঁটা উর্দিপরা অর্ডালি লখন সিং। রাজভবনের গাড়ি থেকে লখন সিং-কে নিয়ে নামতেই প্ল্যাটফর্মের কিছু লোক একবার দেখে নিল। জি-আর-পি'র একটা কনস্টেবল সেলামও দিল।

ক্যাপ্টেন গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট শেষ করল। একবার হাতের ঘড়িটা দেখল। ট্রেন আসতে মিনিট পনেরো বাকি। প্লাটফর্মে পায়চারি করার জন্য একটু এগোতেই ক্যাপ্টেন আবাক হয়ে গেল।

'একি মাসিমা, আপনিও এসেছেন?' এক মুহূর্ত থেমে জিজ্ঞাসা করল, 'কার সঙ্গে এলেন?'

'উনিও এসেছেন।'

'সে কি? মেসোমশাইও এসেছেন?'

শুধু ক্যাপ্টেন নয়, ওর মা ট্রেন থেকে নেমেই ওদের পেয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'একি আপনারা কষ্ট করে এলেন কেন? মণিকাই তো নিয়ে যেতে পারত।'

ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, 'আপনি দয়া করে আমাদের ওখানে আসছেন আর আমরা আসব না।'

মণিকার মা বললেন, 'আপনার কথা এত শুনেছি যে দেখার আগ্রহটা চেপে রাখতে পারলাম না?'

ক্যাপ্টেনের মা বললেন, 'আমিও কি আপনাদের বিষয়ে কম জানি? আপনাদের না দেখলেও আপনারা আমার অপরিচিত নন।'

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মণিকা বাড়িতেই আছে?'

ওর মা জানালেন, 'হ্যাঁ।'

গাড়িতে মালপত্র চাপানো হতেই ওরা রওনা হলেন।

দুটো গাড়ি পর পর থামতেই মণিকা বেরিয়ে এসে ক্যাপ্টেনের মাকে প্রণাম করল। ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, 'দীর্ঘজীবী হও মা!'

সবাই মিলে ড্রইংরুমে গিয়ে বসে খোসগল্প শুরু করলেন। খানিকটা পরে মণিকার মা ভেতরে চলে গেলেন। নিশ্চয়ই সংসারের তদারকির জন্য। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে ক্যাপ্টেনের মাকে বললেন, 'আর এখন গল্প করবেন না! এবার হাত মুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট করে নিন।'

ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে জানাল, 'মাসিমা, আমি যত বেশি খাই, আমার মা তত কম খান। ব্রেকফাস্ট—ট্রেকফাস্টের ঝামেলা মা'র নেই।'

'সে কি? এখন কিছু খাবেন না?'

মিসেস ব্যানার্জি একটু অবাক হলেন।

'সকালে আমি কিছু খাই না।'

'সারা রাত ট্রেন জার্নি করে এসে একটু কিছু মুখে দেবেন না, সে কি কথা?'

ব্যানার্জি-দম্পতি সত্যি একটু অস্বস্তিবোধ করছিলেন। তাইতো ক্যাপ্টেন আবার বলল, 'স্নান-টান সেরে এক গেলাস সরবৎ ছাড়া আর কিছু খান না।'

'চলুন আপনারা ব্রেকফাস্ট খাবেন। আমি বসে বসে গল্প করব এখন।'

এতক্ষণে মণিকা বলল, 'আপনি বরং স্নানটা সেরে নিন।'

'একটু গল্প-টল্প করি। তারপর স্নান করব এখন। এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই।'

মণিকার মা আবার ভেতরে চলে গেলেন। ক্যাপ্টেনের মা এবার মণিকাকে বললেন, 'চল মা, তোমাদের বাড়িটা ঘুরে দেখি।'

মণিকা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন।'

একতলা ঘুরে দোতলায় গিয়ে মণিকা বলল, 'এটাই আমার ঘর।'

'তা আমি জানি।'

মণিকা ঘাড় ঘুরিয়ে পাশ ফিরে চাইল। 'আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ মা। আমি জানি। মানিক আমাকে সব কিছু লেখে।'

'সব কিছু?' মণিকা লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে।

'আমি তোমার এই ঘরে তোমার কাছেই থাকব কেমন?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাছাড়া এ বাড়িতে তুমিই তো আমার সব চাইতে আপন।'

মণিকা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

ক্যাপ্টেনের মা এবার মণিকার মুখখানা তুলে ধরে বললেন, 'সত্যি বলছি মা। মানিকের চিন্তায় আমি রাত্রে ঘুমুতে পারি না। কোন দোষ না করলেও ভগবান ওকে বড় শাস্তি দিয়েছেন।

মণিকা একবার মুহূর্তের জন্যে ওর দিকে তাকিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

ক্যাপ্টেনের মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

মণিকা কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারল না কিন্তু অজস্র অজানা সম্ভাবনার জন্য বিশ্রী অস্বস্তিবোধ করল সারাদিন।

শুধু কি অস্বস্তি?

উৎকণ্ঠাও। ক্যাপ্টেনের জন্য একটা চাপা উৎকণ্ঠাও বোধ করল। জীবনে কী এমন আঘাত পেয়েছে ও? তাই কি ও এতটা সংযত, সংহত?

সমবেদনাও বোধ করল। মনটা ভীষণ নরম হয়ে গেল। নিজের সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবেসে ওর অতীত জীবনের সব দুঃখ, সব অভাব মুছে ফেলে দিতে চাইল।

সারাটাদিন বেশ কাটল। হাসি, গল্প, গান। রেঙ্গুনের গল্প, এলাহাবাদের গল্প। ক্যাপ্টেনের

ছোটবেলার গল্প। আরো কত কি। বুড়ো অধ্যাপক মণ্ডকে নিয়েই কাটল বেশ কিছুক্ষণ!

ব্রেকফাস্টের পরেই ক্যাপ্টেন চলে গিয়েছিল গভর্নমেন্ট হাউসে। অনেক কাজ ছিল। তবুও ঘণ্টায় ঘণ্টায় টেলিফোন করছিল। মাকে, মাসিমাকে, মণিকাকে।

'তুমি কখন বেরুবে?'

'কোথায় আর বেরুব?'

'বিজয়া মাসিমার সঙ্গে দেখা করবে না?'

'আজকে আর যাচ্ছি না।'

'এমনি তো একটু ঘুরতে বেরুবে।'

'নারে বাবা না। আজ আমি কোথাও বেরুব না। এদের সঙ্গে গল্পগুজব করি। কাল—পরশু দেখা যাবে।'

ক্যাপ্টেন বুঝল জোর আড্ডা জমেছে। 'তাহলে আজ আর আমাকে দরকার নেই?'

'দরকার থাক আর নাই থাক, তোর কাজকর্ম শেষ হলে চলে আসিস।'

পরে একবার মণিকাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মাকে কেমন লাগছে?'

'তোমার চাইতে ভালো।'

'নিশ্চয়ই! সে বিষয়ে আবার ডাউট আছে নাকি? আফটার অল সি ইজ মাই মাদার।'

'তাই নাকি?'

'এক্সকিউজ মি ইওর এক্সেলেন্সি! ডু ইউ নিড ইওর এ-ডি-সি এনি টাইম টু-ডে?'

মণিকা ফিস ফিস করে বলেছিল, 'আই ডোন্ট নিড ইউ বাট তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

বিকেলে দিকে ক্যাপ্টেন এসেছিল। কিছুক্ষণ গুল্পগুজব করে চলে যাচ্ছিল। মা বললেন, 'আমার ফেরার টিকিটটা কাটতে ভুলিস না।'

'তুমি কবে যাবে?'

'ভাবছি পরশু চলে যাব।'

মিসেস ব্যানার্জি প্রতিবাদ করলেন সঙ্গে সঙ্গে। 'তাই কি হয়? সপ্তাহ খানেক তো থাকুন, তারপর দেখা যাবে।'

'ওকে যে একলা রেখে এসেছি। বেশি দিন থাকি কি ভাবে?'

হঠাৎ মণিকা বলে ফেললো, 'তাহলে এখন এলেন কেন?'

'কি করব মা? অনেকদিন ছেলেটাকে দেখি না ; তাছাড়া তোমাদের দেখতেও ভীষণ ইচ্ছা করছিল।'

মিসেস ব্যানার্জি বললেন, 'তাই বলে আপনি পরশু যেতে পারবেন না।'

ক্যাপ্টেন বলল, 'তুমি বরং আজকের দিনটা চিন্তা কর। কাল আমাকে তোমার ডিসিশন জানিয়ে দিও।'

'তোর ওসব চালাকি ছাড়। এই করে করে তুই আমাকে সেবারের মতো করবি ভাবছিস, তাই না?'

'সত্যি সেবার মাকে মীরাটে আনিয়ে কি কাণ্ডটাই না করেছিল। আজ না কাল, কাল না পরশু করতে করতে তিন সপ্তাহ কাটিয়ে দিয়েছিল।

ক্যাপ্টেন চলে যাবার পর ওর মা মীরাট ষড়যন্ত্রের কাহিনিটা শোনালেন। 'মানিকটা যে কী, বুঝি না। এত বড়ো হল কিন্তু এখনও ছেলেমানুষি গেল না।'

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ডক্টর ব্যানার্জি স্টাডিতে বসে বসে কিছুক্ষণ গল্পগুজব হল। অনেক

কথার মাঝখানে ডক্টর ব্যানার্জি হঠাৎ বললেন, 'একটা ভালো ছেলের হাতে এই মেয়েটাকে তুলে দিতে পারলে আমরাও দু'জনে বেরিয়ে পড়তে পারি।'

'ওর জন্য আর এত দুশ্চিন্তার কি আছে? মণিকার মতো মেয়েকে ঘরে নিতে পারলে অনেকেই খুশি হবেন।'

ব্যস। ওই পর্যন্তই। দু'পক্ষের কেউই আর এগোতে পারেননি। ডক্টর ব্যানার্জি তাড়াহুড়ো করতে চাননি। ক্যাপ্টেনের মা এগোতে পারেননি নিজের সংকোচের জন্য।

গল্পটল্প করে উপরে যেতে যেতে অনেক রাত হয়ে গেল।

'আমার জন্য তোমার শুতে শুতে অনেক রাত হয়ে গেল, তাই নাম মা?'

'না, না, এমন কি রাত হল?'

সেই শুরু।

ক্যাপ্টেনের মা শোবেন বলে মণিকার ঘরে নীচের থেকে একটা খাট এনে পাতা হয়েছে। দুটো সিঙ্গলবেডের খাটের মাঝে বেশ খানিকটা ফাঁক।

'খাটটা একটু এগিয়ে নিই, কি বল মা! এত দূরে থাকলে তোমার সঙ্গে গল্প করব কেমন করে।'

মণিকাই খাট দুটোকে টেনে পাশাপাশি করল।

'দু'জনেই শুয়ে পড়লেন।

'তোমার এত কাছে শুলে তোমার অসুবিধে হবে না তো?'

'না, না, অসুবিধে হবে কেন? আমি তো ভেবেছিলাম এই একটা খাটেই শোব কিন্তু মা বললেন আপনার কষ্ট হবে।'

তারপর কিছু মামুলি কথাবার্তা।

'মানিকের চিঠিতে পড়তাম তোমরা খুব ভালো লোক কিন্তু সত্যি ভাবিনি তোমরা এত ভালো।'

মণিকা প্রথমে কিছু জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে। একটু পরে বলে, 'নিশ্চয়ই খুব বাড়িয়ে বাড়িয়ে লেখেন।

খানিকটা লজ্জা-দ্বিধার সঙ্গে কথা কটা বলল। ক্যাপ্টেনের মা-র কাছে ক্যাপ্টেনকে কি বলে উল্লেখ করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ক্যাপ্টেনকে ক্যাপ্টেন বলাটা উচিত মনে হল না। উনি বা ও বলতেও লজ্জা করল।

'বাড়িয়ে লেখার ছেলে ও না! তুলাদণ্ডের বিচার করে ও কথা বলে, চিঠি লেখে...'

কথাটা শেষ হবার আগেই একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

'...ওরা বাব জাজ্ হয়েও বিচারে ভুল করেছেন কিন্তু মানিক?...'

আবার থামলেন। আবার বললেন, 'অসম্ভব।'

মণিকাটা চুপ করে শুয়ে আছে। মুখোমুখি।

'মানিক যে বিচারে ভুল করে না, তার প্রমাণ চাও?'

মণিকা হাসল। 'আপনি মা হয়ে ওকে বেশি চিনবেন, না কি আমি?'

'প্রফেসর মণ্ডকে দেখাশুনা করতে গিয়ে যখন তোমার সঙ্গে, তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে ওর আলাপ হল তখনই আমাকে জানাল। আজ সারাদিন তোমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে ওর সেই চিঠিটার কথা ভাবছিলাম।'

'কেন?'

'আলোটা জ্বাল।'

মণিকা উঠল। আলোটা জ্বালল।

'আমার স্যুটকেসটা খোল।'

মণিকা স্যুটকেসটা খুলতেই বললেন, 'উপরের শাড়িটার তলায় একটা লম্বা খাম আছে না?'

শাড়িটা তুলতেই খাম পেল।

'এদিকে নিয়ে এসো।'

মণিকা খামটা নিয়ে খাটের উপর বসল।

ক্যাপ্টেনের মা বললেন, 'ভেতরের চিঠিটা পড়ে দেখ।'

'আপনার চিঠি আমি পড়ব?'

'পড় না। মার কাছে লেখা ছেলের চিঠি পড়তে লজ্জা কি?'

ছোট্ট চিঠি।—'প্রফেসর মণ্ড যে আসছেন, সেকথা তোমাকে আগেই জানিয়েছি। সেদিন ওই বৃদ্ধ অধ্যাপককে দেখতে গিয়ে আলাপ হল একটা বাঙালি মেয়ের সঙ্গে। মণিকা ব্যানার্জি। তারপর ওর বাবা-মা'র সঙ্গে। ডক্টর ব্যানার্জি রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন এবং সেই সূত্রে ওদের আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা। তুমি তো জান আমি তোমার কোলের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারলেই সবচাইতে ভালো থাকি। খুব বেশি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে আমার মোটেও ভালো লাগে না, পছন্দও করি না। বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে আমার অনেক দ্বিধা অনেক ভয়। তবুও ওদের সবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলাম। ডক্টর ব্যানার্জি দেবতুল্য লোক আর ওর স্ত্রী? মাসিমা? তোমার দ্বিতীয় সংস্করণ। তোমার এই হ্যাংলা ছেলেটাকে কি আদর-যত্ন করেই খাওয়ান!...'

চিঠিটা পড়তে পড়তেই মণিকা হাসল।

'হাসছ কেন?'

'এইসব হ্যাংলা-ট্যাংলা লেখার কোন মানে হয়।'

উনিও হাসতে হাসতে বললেন, 'ওর কথা বাদ দাও।'

মণিকা আবার চিঠিটা পড়তে শুরু করল...'মণিকা? রূপ-যৌবন শিক্ষা-দীক্ষা থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণচূড়ার মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নিজের অহমিকা প্রচার করতে শেখেনি কিন্তু কাছে এলেই রজীনগন্ধার মতো সৌরভে ভরিয়ে দেয় সবাইকে। গভীরতা আছে কিন্তু উচ্ছলতা নেই! তুমি যখন কলকাতা আসবে, তখন আলাপ করিয়ে দেব। নিশ্চয়ই ওদের সবাইকে তোমার ভালো লাগবে।...'

চিঠিটা পড়া শেষ হল। তবুও মণিকা মনে মনে আবৃত্তি করল, কৃষ্ণচূড়ার মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নিজের অহমিকা প্রচার করতে শেখেনি কিন্তু কাছে এলেই রজনীগন্ধার মতো সৌরভে ভরিয়ে দেয় সবাইকে।

চিঠিটা খামে ভরে আবার স্যুটকেসের মধ্যে রেখে সুইচটা অফ করল। ক্যাপ্টেনের মা-র পাশে শুয়ে পড়ল।

'তোমাদের সঙ্গে দু'চার দিন মেলামেশা করেই ওই চিঠি লিখেছিল...'

রাত্রিতে নিস্তব্ধতার মধ্যে দু'জনে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ক্যাপ্টেনের মা বললেন, 'অনেক আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি কিন্তু...'

গলা দিয়ে যেন কথা বেরুতে পারল না।

মণিকা একটু অস্থির, একটু চঞ্চল হয়ে উঠল, 'কিন্তু কি...'

'তুমি কি আমাদের ক্ষমা করতে পারবে?'

'একি বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি মা।'

মণিকা একটু থতমত খায়। তবু বলে, 'আপনারা আবার অন্যায় কি করলেন যে ক্ষমা চাইছেন?'

'হয়তো ইচ্ছা করে করিনি কিন্তু ঘটনাচক্রে অন্যায় করেছি বৈকি।'

গলার স্বরটা ভেজা ভেজা। হয়তো দু'এক ফোঁটা চোখের জল পড়তেও শুরু করেছে। মণিকা সাহস দেবার জন্য বলল, 'কিছু না কিছু অন্যায় সব মানুষেই করে তার জন্য এত...'

'ঘটনাটা যে বড়ই লজ্জার, বড়ই দুঃখের।'

ওই অন্ধকারের মধ্যে ছলছল জলভরা কাতর দুটি চোখ দেখতে পেল মণিকা। 'ওসব ভুলে যান। অত চিন্তা করার কি আছে?'

'তুমি ক্ষমা করলে, তুমি ভিক্ষা দিলে হয়তো সত্যি ভুলে যাব, হয়তো...'

'ছি ছি, আপনি অমন করে বলবেন না।' মণিকা দুটি হাত দিয়ে বৃদ্ধার দুটি হাত চেপে ধরল।

'এই রাত্রির অন্ধকারেও তোমাকে সে কথা বলতে ভয় করছে, লজ্জা করছে...'

'কি দরকার সে কথা বলার?'

'তোমাকে না বললে তো চলবে না মা।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ মা।'

মণিকা ঘাবড়ে গেল। 'আপনি কাঁদছেন?'

মণিকা তাড়াতাড়ি উঠে বসে হাত দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিল। 'আপনি একটু ঘুমোন।'

'সারাটা বুকের মধ্যে তোলপাড় করছে। তোমাকে সবকথা না বলা পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম আসবে না।'

'বলুন না কি কথা।'

'বলব?'

'নিশ্চয়ই।'

'সবকথা শোনার পর আমাকে, মানিককে, মানিকের বাবাকে ক্ষমা করতে পারবে কি? ঘেন্নায় আমাদের দূরে ঠেলে দেবে না তো?'

মণিক দু'হাত দিয়ে ক্যাপ্টেনের মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার ওইসব কথা বলছেন?'

'বলব না মা?'

রাত্রি আরো গভীর হল। গভীর হল দুটি প্রাণ, দুটি মন ক্যাপ্টেনের মা আর দূরে সরে থাকতে পারলেন না, লুকিয়ে রাখতে পারলেন না মনের কথা।

'...তিন পুরুষ ধরে এলাহাবাদে ওদের বাস। যথেষ্ট সম্মান সম্ভ্রম নিয়েই বাস করছিলেন। আজও সে সম্মান সম্ভ্রম নষ্ট হয়নি সত্য কিন্তু হঠাৎ একটা ভূমিকম্পে সারা সংসারটা ভেঙেচুরে ছারখার হয়ে গেল।'

'ভূমিকম্প?'

'তার চাইতেও খারাপ মা। মানিক কমিশনড়...অফিসার হল। ওর বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগে পড়লাম আমরা দু'জনে। বেনারসের একটা মেয়ে পছন্দ করা হল। বাবা-মা নেই। গরিব মাসির কাছে মানুষ হয়েছে। দেখতে শুনতেও বেশ। তাছাড়া বি-এ পাশ ছিল। জাস্টিস রায়ের

ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে শুনে ওরা তো হাতে স্বর্গ পেলেন।...'

মণিকা একটু উতলা হয়ে পড়ে, 'তারপর?'

'খুব ধুমধাম করে বিয়ে-বৌভাতও হল। মানিকের একদম ছুটি ছিল না বলে বৌভাতের পরের দিনই চলে গেল পাঠানকোট।'

মণিকা পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে শুনল।

'মাস খানেক বেশ কাটল। খুব আনন্দে কাটল। কিন্তু তারপর একদিন কয়েক মিনিটের মধ্যে..'

থেমে গেলেন। আর যেন বলতে পারছিলেন না। গলার স্বরটা আরো ভারি হয়ে উঠেছিল। লজ্জায়, ঘেন্নায়, দুঃখে কিছুক্ষণ বাক-শক্তি রহিত হয়ে বসে রইলেন।

না, না, চুপ করে বসে থাকলে চলবে কেন? এই রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেই সব কিছু বলতে হবে, সব কিছু ফয়সালা করতে হবে।

...'আমি গঙ্গা পুজো দিতে গিয়েছিলাম ত্রিবেণীতে। সঙ্গমে সন্ধ্যার সময় একলা একলা যাওয়া ঠিক হবে না বলে চাকরটাও গিয়েছিল আমার সঙ্গে। ফাঁকা বাড়িতে শুধু পুত্রবধূকে পেয়ে ওর মাথায় যে কি ভূত চাপল, জানি না। হঠাৎ উত্তেজনায় উনি কয়েক মুহূর্তের জন্য পশু হয়ে গিয়েছিলেন।...

আবার একটু থামতে গিয়েছিলেন। উত্তেজনায় সারা শরীর কাঁপছে। গলা দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। তবুও থামতে পারলেন না।

'...এই কলঙ্ক নিয়ে মেয়েটা বাঁচতে চাইল না। আলমারির লকার থেকে রিভলভার বের করে নিজেকে শেষ করে দিল...'

মণিকা তাড়াতাড়ি দুহাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, 'সে কি?'

'হ্যাঁ মা।'

এখানেই শেষ করেননি সে সর্বনাশা কাহিনি। বলেছিলেন কিভাবে সব ব্যাপারটা ধামা চাপা দেওয়া হয়। দুনিয়ার সবাই জানল, জাস্টিস রায়ের পুত্রবধূ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে কিন্তু স্তম্ভিত জাস্টিস রায় স্ত্রীর কাছে, একমাত্র পুত্রের কাছে সব কথা বলেছিলেন। নিজের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন।

'জানো মা, ওর মতো দেবতুল্য মানুষ হয় না। কিন্তু তবুও কেমন করে মুহূর্তের উত্তেজনায় উনি এমন কাজ করলেন, তা ভেবে পাই না। মানিককে উনি নিজের প্রাণের চাইতেও ভালোবাসেন। তবুও এসব হল কেমন করে, ভেবে পাই না।'

কাঁদতে কাঁদতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন বৃদ্ধা।

'তারপর থেকে মানিক আর এলাহাবাদ যায়নি। আর ওর বাবার অবস্থা দেখলে তুমি চোখের জল রাখতে পারবে না। এত বড় অন্যায় করেও কোনো শাস্তি না পেয়ে মানুষটা যে কিভাবে তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে, প্রতি মুহূর্ত জ্বলেপুড়ে মরছে, তা তুমি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না মা...

মণিকাও স্থির থাকতে পারেনি। রায় পরিবারের সর্বনাশা কাহিনি শুনতে শুনতে চোখের দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে গেছে।

'এই অর্ধমৃত স্বামী আর ঘর ছাড়া পুত্র নিয়ে আমি যে কিভাবে বেঁচে আছি, তা ভাবতে পার মা? মানিককে কি আমি কোনোদিন ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারব না? ওর বাবা কি মৃত্যুর আগে আর মানিককে দেখতে পারবে না?...'

না, না, আর না। আত্মসমর্পণ করতে লজ্জা কি? এই বাকি রাতটুকুর মধ্যে যদি আত্মসমর্পণ

করে ক্ষমা না পাই, তবে তো ভোরের আলোয় মুখ দেখাতে পারব না।

দু'হাত দিয়ে মণিকার মুখখানা চেপে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন, 'তুমি কি পার না মা আমাদের সবাইকে ক্ষমা করতে, আমাদের সবাইকে বাঁচাতে?'

মণিকাও হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। ক্যাপ্টেনের মা-র বুকের মধ্যে নিজের মুখটা লুকিয়ে রেখে শুধু একবার চীৎকার করে বলে উঠল, 'মা!'

'মা?'

মণিকা আবার কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, 'অমন করে কাঁদতে নেই মা!'

'মা?'

'আমি তোমার মা? তুমি আমাকে মা বলে ডাকলে? তুমি কি আমাদের ক্ষমা করলে মণিকা?'

মণিকা আর একটি কথারও জবাব দিতে পারল না।

অনেকক্ষণ কেটে গেল।

'একটু আলোটা জ্বালবে মা?'

'কেন?'

'তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছা করছে মা।'

মণিকা তবুও চুপ করে বুকের মধ্যে মুখটা লুকিয়ে রেখে পড়ে থাকে। ক্যাপ্টেনের মা আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'একটু আলোটা জ্বাল না মা! তোমাকে যে ভীষণ দেখতে ইচ্ছা করছে।'

নববধূর মতো দ্বিধা সংকোচে ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে আলো জ্বেলেই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

ক্যাপ্টেনের মা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে নিজের চোখের জল মুছে উঠে গেলেন মণিকার কাছে। আঁচল দিয়ে মণিকার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ওর কপালে একটা চুমু খেলেন।

মণিকা ঝপাং করে একবার ওর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেই দু'হাত দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরল।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। আনন্দেও দু'জনের চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ মণিকার মুখটা তুলে ধরে বললেন, 'একটা জিনিস দেখবে?'

'কি?'

'এসো।'

নিজেই নিজের স্যুটকেসটা খুলে কাপড়-চোপড়ের নীচে থেকে একটা ফটো বের করে বললেন, 'মানিক কমিশনড্ অফিসার হবার পর ওর বাবার সঙ্গে এই ছবিটা তোলা হয়।'

মণিকা একটু অবাক হয়েই ফটোটা দেখল। পুত্রের গর্বে জাস্টিস রায়ের চোখ মুখ জ্বল জ্বল করছে। অথচ এই মানুষটাই...

দুর্ঘটনা কার জীবনে কখন ঘটে যায় তা বলা যায়?

হঠাৎ দু'জনের খেয়াল হল পূর্বের আকাশটা ফর্সা হয়ে উঠেছে। মণিকা সুইচটা অফ্ করে দিয়ে বলল, 'মা, এসব কথা কিন্তু আমার বাবা-মা বা অন্য কাউকে বলবেন না।'

'আচ্ছা।'

'আর এলাহাবাদে গিয়েই একবার বাবাকে পাঠিয়ে দেবেন।'

'দেব?'

'নিশ্চয়ই! কয়েকটা মুহূর্তেই দুর্ঘটনা ঘটে কিন্তু ওই কটা মুহূর্তটা তো জীবন নয়। জীবন অনেক বড়। অনেক ব্যাপ্ত।'

তিন মাস পর।

ক্যাপ্টেন, আর্মি হেড কোয়ার্টার্সে ট্রান্সফার হল। ইমিডিয়েটলি জয়েন করতে হবে। তাইতো বাসা ভাড়া করে কলকাতাতেই সব কাজ সেরে নেওয়া হল।

ওয়ান আপ দিল্লি মেলের এয়ার-কন্ডিসনড্ বগীর সামনে বেশ ভিড় জমে গেছে। জনে জনে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা দু'জনে। গুরুজনদের প্রণাম করল, মাথায় তুলে নিল আশীর্বাদ।

'দশ-পনের দিনের মধ্যেই আসবেন তো বাবা?'

'আসব মা।'

'ঠিক বলছেন তো?'

জাস্টিস রায় হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি আমার মা, তুমি আমার চিফ্ জাস্টিস! তোমাকে কি মিথ্যা কথা বলতে পারি?'

সবাই হাসল। বৃদ্ধ আমজাদ শুধু একবার মাথা নিচু করে চোখ দুটো মুছে নিল।

ট্রেন ছাড়ল।

কূপের মধ্যে গিয়েই ক্যাপ্টেন একে একে সব লাইটগুলো অফ করে দিল।

'একি? এখুনি আলো অফ্ করছ কেন?

মণিকাকে দু'হাত দিয়ে আলতো করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'মণিমালা এখনও আলো অফ্ করব না?'